# ছায়ার শরীর

সমরেশ মজুমদার

তপনজ্যোতি বড় মেয়ে পৃথাকে অন্যরকমভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পৃথা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষনের ভাবজগতে থাকতে ভালবাসে। তপনজ্যোতির পূর্ণ মত না থাকলেও অল্প বয়সে পৃথার বিয়ে হয়ে যায় শিলচরে। স্বামী প্রণবকুমার এয়ারফোর্সের কর্মী, পুণেয় থাকে। বিয়ের পর আচমকা এক সংস্কারগ্রস্থ পরিবারে গিয়ে বড় মুশকিলে পড়ে পৃথা। বাবা তাকে শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতই ধর্মগ্রন্থ। কিন্ত তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যে সাহিত্য-সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। স্থুলরুচির স্বামী প্রণবকুমার যেন শরীরসর্বস্ব জন্ত অল্প কয়েকদিনেই প্রণবকুমার পৃথাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যায়। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার অবসাদ নিয়েই গর্ভবতী হয় পৃথা। শশুরবাড়ির অযত্নে মরণাপন্ন হয় সে, তার বাবা-ম কোনও খবরই পায় না। নানা ঘটনার পর পিতৃগৃহে তার প্রসব হলেও সন্তানকে স্বাভাবিক মায়ের মতো কাছে নিতে পারে না সে। বই আর গানের ভুবনে স্বেচ্ছাবন্দি পৃথার জীবন ছুটে চলে আরও নিষ্ঠুর সত্যের দিকে। সমরেশ মজুমদারের ছায়র শরীর' উপন্যাসটি এক সংবেদনশীল মেয়ের বিষাদময় জীবনের কথকতা।

# ছায়ার শরীর

# ছায়ার শরীর

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১

© সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-981-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

CHAYAR SARIR
[Novel]
by
Samaresh Majumder
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

## নিবেদন

এই উপন্যাসটি গত বছরের আনন্দবাজারের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের নায়িকা বিবাহসূত্রে শিলচরের যে পরিবারে পৌঁছেছিল তাঁদের কথ্যভাষা সে বুঝতে পারেনি। বাঙালি, তা তিনি চট্টগ্রাম, সিলেট, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া যেখানেই বাস করুন তাঁদের কথ্যভাষা লেখার ভাষা থেকে আলাদা হতেই পারে। কিন্তু আমার লেখা পড়ে শিলচরের মানুষ আহত হয়ে প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে বিক্ষোভ নিয়ে গিয়েছিলেন।

কাউকে আঘাত দিতে আমি চাইনি। যদি কেউ আহত হন তা হলে উপন্যাসটির অংশবিশেষ পরিমার্জনা করা ছাড়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

তারাশঙ্কর বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা লিখেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষা মূল ভাষারই একটি শাখা। তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্য সংবাদপত্রের খবর নয়। তবু—!

**সমরেশ মজুমদার**

মেয়েরা যতই বড় হয়ে উঠুক, রাত্রে শোওয়ার সময় স্ত্রীর পাশে না শুলে কিছুতেই ঘুম আসে না তপনজ্যোতির। ঠিক দশ বছরের ছোট মায়াবতী, ইতিমধ্যে চার কন্যার জননী। মাঝে মাঝে তিনি মৃদু প্রতিবাদ করেছেন, শোওয়ার ব্যবস্থা বদলাতে চেয়েছেন। কিন্তু জোর করতে পারেননি। তৃতীয় কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ফরেস্ট রেঞ্জারের মা শিবানীমাসিমার সঙ্গে নিজের কুষ্ঠি নিয়ে কুচবিহারে গিয়েছিলেন সকাল সকাল। শিবানীমাসিমার খুব ভরসা সেখানকার বিখ্যাত জ্যোতিষী কালীপদ ন্যায়তীর্থের ওপর। তিনি আধঘণ্টা ধরে কুষ্ঠি বিচার করেছেন, করে বলেছেন, 'কোনও চিন্তা নেই মা, তোমার পুত্র সন্তান হবে।'

শিবানীমাসিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সময়টা যদি বলে দেন—!'

'পঞ্চম সন্তান পুত্র হবেই।'

শিবানীমাসিমার গলায় খুশি ফুটেছিল, চার সন্তানের মা হয়েও মুখে রক্ত জমেছিল মায়াবতীর। একশো টাকার নোট প্রণামী হিসেবে দিয়েছিলেন মায়াবতী। বাইরে বেরিয়ে এসে শিবানীমাসি বলেছিলেন, 'আর তোমার চিন্তা নেই। মেয়েরাও তো সন্তান। চার চারটে সন্তান যখন হয়ে গেছে তখন ধরে নিতে পারো তুমি এবার পুত্রবতী হবেই। তবে এখনই কাউকে বলার দরকার নেই। এমনকী ডাক্তারবাবুকেও বোলো না। কথা চাউর হলে ওজন কমে যায়।'

মাথা নেড়েছিলেন মায়াবতী। কীরকম শিহরন ছড়িয়েছিল শরীরে।

শিবানীমাসিমা উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তবে কিনা, লোকে পুত্রকেই সন্তান বলে। সন্তান বংশরক্ষা করে। মেয়ে তো ক'দিন বাদেই গোত্র পালটাবে, পদবিও। তবু যদ্দিন সেটা না হচ্ছে তদ্দিন তো বাড়িরই সন্তান। তাই বলি, শরীরের ওপর খেয়াল রেখো, শুধু নিজের শরীর নয়, ডাক্তারবাবুরও। দু'বেলা মাছ মাংস ডিম তো খাবেই, শক্তি বাড়ে

এমন ওষুধ ডাক্তারবাবুকে এনে দিতে বোলো। আর হ্যাঁ, দু'বেলা উনুনের সামনে যাবে না। কাঠের আগুনের তাত সন্তান না হওয়া পর্যন্ত একবারের বেশি লাগাবে না।'

'ভাল বললেন। দু'বেলা রান্না না করলে বাড়িতে বাজ পড়বে।'

'আহা! রান্না হবে না কেন? সকালটা তুমি করবে, মেয়েদের ওপর বিকেলটা ছেড়ে দাও। তোমার বড় মেয়ে পৃথার বয়স কত হল?'

'পনেরোতে পড়েছে।'

'তবে? ওই বয়সে আমার ছেলের বয়স ছিল এক। তেরোর বিয়ে হয়েছিল আমার।'

'তা হলেই হয়েছে। বাপসোহাগি মেয়ে। সেই তিন-চার বছর বয়স থেকে আপনাদের ডাক্তারবাবু এমন বদ অভ্যেস তৈরি করে দিয়েছেন যে ওর দিকে তাকালেই গা জ্বলে যায়।'

'কেন গো?'

'আচ্ছা, এই যে বিকেলে সামনের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে, গল্প করে, পৃথাকে কখনও সেখানে দেখেছেন? স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়েই গল্পের বই নিয়ে বসে গেলেন। আবার স্কুলের পড়া শেষ করে রাতের খাবার খেয়ে বইমুখো হত। বকেঝকে সেটা বন্ধ করেছি।'

'কিন্তু তোমার মেজ মেয়ে নীতা—।'

'ও তো ডানপিটে। ছেলে হতে হতে মেয়ে হয়ে গিয়েছে। হাঁটাচলা, কথা বলার ধরন দেখে মেয়েমানুষ বলে মনেই হয় না। এরা রাঁধবে?'

'না। এটা ভাল হচ্ছে না মায়াবতী। দু'দিন বাদে শ্বশুরবাড়িতে গেলে তোমরাও গালাগালি শুনবে। অন্তত সপ্তাহে একদিন জোর করে রান্নাঘরে ঢোকাও। আর রাত্রের জন্যে লোক রাখো। বলো তো আমাদের বাড়িতে যে রাঁধে তার বোনকে পাঠিয়ে দিই।'

'খুব ভাল হয়। তবে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি—।'

মায়াবতী যখন বাড়িতে ঢুকলেন তখন সূর্য গাছের ওপারে। বারান্দায় পা রাখতেই গান শুনতে পেলেন। কলের গান। কিন্তু এই গান কখনও

শোনেননি তিনি। 'ওগো প্রিয়, জাগব বাসর শূন্য শয্যা পাতি। আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ...।'

দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তাঁর চোখ কপালে উঠল। গ্রামাফোনে রেকর্ড চালিয়ে মেঝেতে বসে চোখ বন্ধ করে গানের কথার সঙ্গে ঠোঁট নাড়ছে পৃথা। পনেরো বছরের মেয়ে শূন্য বাসর জাগার স্বপ্ন দেখছে। খপ করে চুলের গোছা মুঠোতে ধরে টেনে দাঁড় করলেন মেয়েকে, তারপর ঠাস করে চড় মারলেন।

মার খেয়ে ছিটকে গেল মেয়ে। তারই মধ্যে চোখের কোণে এমনভাবে তাকাল যে মায়াবতীর রাগ আরও বেড়ে গেল। 'ওইভাবে তাকাচ্ছিস? এতখানি সাহস? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। কোথায় পেলি? কার কাছ থেকে নিয়ে এলি? কোন বদ লোক রেকর্ডটা দিয়েছে?'

মেয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল। গ্রামাফোনটাকে বন্ধ করলেন মায়াবতী, 'কথা বল। নইলে ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। ওই এক কায়দা শিখেছে। মার খেয়েও মুখ খুলবে না। আজ থেকে তোর খাওয়া বন্ধ।'

'তুমি দিদির সঙ্গে ওরকম করছ কেন?' পেছনের দরজা থেকে নীতার গলা ভেসে এল। মায়াবতী সেদিকে তাকিয়ে মেজ মেয়েকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আমি কী করছি। অ্যাঁ? ওকে বলছি তো তোর গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন?'

'কেন পড়বে না? ও আমার দিদি!'

'বাব্বা! দিদি! এই রেকর্ড তোর দিদি কার কাছ থেকে এনেছে?'

'কার কাছ থেকে আনবে! বাবা দিয়েছে।'

'বাবা দিয়েছে? এই রেকর্ড তোদের বাবা এনে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। দিয়ে দিদিকে বলেছে গান দুটো তুলে রাখ গলায়। এই গান পঞ্চাশ বছর পরেও মানুষ শুনবে। বাবা নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে।' নীতা বেরিয়ে গেল বড় বড় পা ফেলে।

সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মায়াবতী। কোন বাপ নিজের মেয়েকে এমন প্রেমের গান এনে দিয়ে বলতে পারে শিখে নিতে? এই গান শিখে মেয়ে যদি কোনও ছোঁড়ার উদ্দেশে গায়? লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যা পাবে তাই মেয়েকে এনে দেবে। রেকর্ড আর বই। মাস কয়েক

আগে নিজে একটা বই পড়ছিল। পড়া হয়ে গেলেই মেয়েকে ডেকে হেসে বললেন, 'নে। পড়ে ফেল।'

আচমকা বইটার নাম দেখে ফেলে শিউরে উঠেছিলেন মায়াবতী। চরিত্রহীন, লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্বনাশ! মেয়েকেও যদি চরিত্রহীন পড়তে দেয় তা হলে ওই মেয়েকে কি বিয়ে দেওয়া যাবে? তার আগে চরিত্র বলে কিছুই থাকবে না ওর। ঝট করে বইটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন। লুকোবার সবচেয়ে ভাল জায়গা হল রান্নাঘরের তাকে মশলার কৌটোগুলোর পেছনটায়। কেউ হাত দেবে না ওখানে। মেয়েরা বা ডাক্তারবাবু ভাবতেই পারবে না ওখানে বই রাখা আছে।

ডাক্তারবাবু চেম্বার থেকে বাড়ি ফেরেন রাত আটটায়। মায়াবতী তখন ঠাকুরঘরে। রাগ বেশি বাড়লে তিনি ঠাকুরঘরে থাকাই পছন্দ করেন। ভগবান সদয় হলে ধীরে ধীরে রাগ কমে যায়। তা ছাড়া তাঁকে ওই সময় ঠাকুরঘরে থাকতে দেখলে ডাক্তারবাবু চলে আসেন দরজায়। ব্যাপারটা বুঝে নিচু গলায় অনুরোধ করতে থাকেন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে।

আজও ডাক্তারবাবু বাড়ি ফিরেই চেঁচিয়ে বললেন, 'কোথায় গেলে সবাই!'

ঠাকুরঘরে বসে আঁচলটাকে গলায় টেনে নিলেন মায়াবতী।

নীতা দৌড়ে গেল, 'মা আজ দিদিকে খুব মেরেছে!'

'সেকী! কেন?' ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'দিদি স্কুল থেকে ফিরে তোমার এনে দেওয়া রেকর্ডটা শুনছিল বলে মা রেগে গেছে।'

'গান শুনে রেগে গেছে। সেকী!'

'বলেছে কোন বদ লোক তোকে ওই রেকর্ড দিয়েছে?' নীতা গলা নকল করল।

সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু, 'বদ লোক! তোর মা বুঝতে পারেনি বোধহয়। আমার আঁধারঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে। তা হলে তো রবীন্দ্রনাথের মতো বদ লোক পৃথিবীতে নেই রে।'

'এই গান কি রবীন্দ্রসংগীত।'

'যা ব্বাবা। এটা আধুনিক গান। রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেন, প্রেমের

জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে, বাঁধন খুলে দাও। তাই পড়ে বা শুনে লোকে ওঁকে যদি বদ লোক ভাবে—। কোথায় সে? ডেকে নিয়ে আয়', বললেন ডাক্তারবাবু।

'কাকে ডাকব? মাকে না দিদিকে?'

'দিদিকে!'

'দিদি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। আসবে না। মা খেতে দেবে না বলেছে। আমি হোমওয়ার্ক শেষ করতে যাচ্ছি।' নীতা পড়ার ঘরে চলে গেল।

ডাক্তারবাবু চলে এলেন মেয়েদের শোওয়ার ঘরে। প্রথম তিন মেয়ে এই ঘরের বড় খাটে শোয়। এখন বড় মেয়ে পৃথা উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিঃশব্দে। মেয়ের পাশে বসলেন ডাক্তারবাবু, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'খুব লেগেছে বুঝতে পেরেছি। আমি তোর মাকে বুঝিয়ে বলব। এবার ওঠ।'

মেয়ে উঠল না, এমনকী সামান্য নড়লও না।

'শোন, তুই না খেলে আজ আমিও খাব না।'

তবু মেয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

কিছুটা সময় অপেক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না মা? তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি যে!'

আর একটু সরে শুল মেয়ে।

'বেশ। যাই তা হলে। আচ্ছা, রেখেই যাচ্ছি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই তো তুই আগে পড়েছিস। সেই যে চাঁদের পাহাড়। এবার তার চেয়েও ভাল আর একটা বই এনেছি। পথের পাঁচালি।'

তৎক্ষণাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা শরীরটার বাঁ হাত প্রসারিত হল। ডাক্তারবাবু বইটা আঙুলের নাগালে পৌঁছে দিলে পৃথা সেটা বই কিনা তা পরীক্ষা করল। তারপর ঝট করে নিয়ে গেল সামনে। বিছানায় চেপে থাকা মুখ একটু ওপরে তুলে বইটার মলাট দেখল। তারপর বাবু হয়ে বসে প্রথম পাতায় চোখ রাখল।

ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, 'এখানে আলো খুব কম। চোখ খারাপ হবে পড়লে, পড়তে ইচ্ছে করলে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়।'

শোনামাত্র মেয়ে বিছানা থেকে নেমে বই নিয়ে দ্রুত পড়ার ঘরে চলে গেল। ডাক্তারবাবু জানেন, মারের ব্যথা অথবা সারা রাত উপোস করে থাকার কষ্ট ওর কাছে এই মুহূর্তে কোনও গুরুত্ব নেই। এখনই বিভূতিভূষণের কল্পনার জগতে ঢুকে গিয়ে পরম আনন্দে থাকবে পৃথা।

দু'বছরের চতুর্থ মেয়েকে একধারে রেখে স্বামীর পাশে শোওয়ার অভ্যেস মায়াবতীর। আজ ওকে মাঝখানে রাখলেন। ডাক্তারবাবু সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কী হল?'

'এবার থেকে এইই হবে।' মায়াবতী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন।

'আমার অপরাধটা কী তা জানলাম না।'

'লজ্জাও করে না। ছিঃ।'

'মানলাম। কিন্তু কেন?'

'বাপ হয়ে ষোলো বছরের মেয়েকে শূন্য বাসর জাগার গান গাইতে বলছ! পাঁচজনে শুনলে মুখ দেখাতে পারবে? কোনও লোক বাড়ির মেয়েদের অসুখ তোমার কাছে নিয়ে আসবে?'

'অ। পৃথার কিন্তু ষোলো হতে এক বছর বাকি আছে।'

'চুপ করো। বাইরের লোককে ওসব কথা বলবে! পনেরো পার হলেই ষোলো। আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল?' মায়াবতী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

'তুমি ছাড়া আর কেউ এই প্রশ্ন করেনি।'

'করবে না। এভাবে চললে সবাই বুঝে নেবে।'

'আশ্চর্য! মায়া, তুমি নিজেকে খুব ছোট করছ।'

'আমি নিজেকে ছোট করছি?' দ্রুত স্বামীর দিকে পাশ ফিরলেন মায়াবতী।

'নিশ্চয়ই। তুমি কবিতা, গান বোঝো না। গল্প উপন্যাস পড়ার সময় পাও না, অভ্যেসও তৈরি হয়নি। তুমি ওই জগৎ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। পৃথিবীর চিরন্তন কবিতা, গান মানুষের হৃদয়ের কথা বলে। এগুলো পড়লে বা বললে মানুষের উন্নতি হয়। বাল্যকাল থেকে এইসব গান বা

কবিতা মানুষের রুচি তৈরি করতে সাহায্য করে। পৃথার মনে এখনই একটু একটু করে ওর নিজস্ব আকাশ তৈরি হচ্ছে। এই আকাশটা যেমন তোমার নেই, তেমনি নীতারও নেই। আমি ওর বাবা হয়ে ওটা তৈরি করতে সাহায্য করছি বলে খুশি। ওকে তুমি ওর মতো থাকতে দাও। আচ্ছা, আমি এখন ঘুমাব।'

মায়াবতী কোনও কথা বলার সুযোগ পেলেন না। খানিকবাদেই ডাক্তারবাবুর নাক ডাকার মৃদু আওয়াজ ভেসে এল। হঠাৎ নিজের ওপর খুব রাগ হল মায়াবতীর। কুচবিহার থেকে ফেরার সময় বাসে বসে ভেবেছিলেন কীভাবে ডাক্তারবাবুকে কালীপদ ন্যায়তীর্থের ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলবেন! ঠিকুজি বিচার করাতে তিনি শিবানীমাসিমার সঙ্গে কুচবিহারে যাবেন বলে ডাক্তারবাবুকে জানাননি। কারণ ডাক্তারবাবু ঠিকুজিবিচার অথবা হাত দেখায় আস্থা রাখেন না এ কথা মায়াবতী জানেন। তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল শিবানীমাসি সোনার দোকানে যাবেন কিন্তু একা বাসে চেপে কুচবিহারে যেতে হয়তো স্বস্তি না পাওয়ায় মায়াবতীকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছেন। ডাক্তারবাবু সেটা শুনে এককথায় সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কালীপদ ন্যায়তীর্থ যে আশার কথা শুনিয়েছেন তা স্বামীকে না জানানো পর্যন্ত মন খচখচ করছিল। বাড়ি ফিরে পৃথাকে ওই গান শুনতে দেখে অমন মাথা গরম না করলেই ভাল হত। কিন্তু স্বামীর কথার সঙ্গেও তিনি একমত নন। এ দেশে মেয়েমানুষ সারাজীবন বই মুখে নিয়ে প্রেমের গান গেয়ে কাটাতে পারে না। তাকে সংসার করতেই হবে। স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ঘর করা, সন্তানের মা হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। পৃথাকে ওর বাবার কাছ থেকে সরানো দরকার। তার একমাত্র রাস্তা হল বিয়ে দেওয়া। নীতা এক বছরের ছোট হলেও ওকে নিয়ে তেমন ভাবেন না মায়াবতী। ওরকম ছেলেলি মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। ওর কপালে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু পৃথাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিলে ও বেঁচে যাবে। বই, গান ছেড়ে সংসারী হবে।

পৃথার যদি বিয়ে হয়ে যায় কয়েক মাসের মধ্যে, আর শ্বশুরবাড়িটা যদি বহু দূরে হয় যেখান থেকে ইচ্ছে করলেই বাপের বাড়িতে আসা যাবে না

তা হলে তিনি অন্য একটা কারণে স্বস্তি পাবেন। সেই কথাটাই স্বামীকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। চার-চারটে মেয়ে ভবিষ্যতে তাঁর কাছে থাকবে না। তখন ডাক্তারবাবুও পৃথিবীতে থাকবেন বলে মনে হয় না। দশ বছরের বড় লোকটা চলে গেলে তিনি একা কী করে থাকবেন? কালীপদ ন্যায়তীর্থ যখন জোর দিয়ে বলেছেন তাঁর পঞ্চম সন্তান ছেলে হবে তখন তিনি চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আসুক। কিন্তু যে মেয়ে শূন্য বাসর জাগার গান গাইছে তার উপস্থিতিতে তিনি কী করে মা হবেন? অসহায় চোখে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকালেন মায়াবতী। লোকটাকে শত্রু বলে মনে হল তাঁর।

কী কপাল! পরদিন দুপুরের পর শিবানীমাসিমা ওঁর কাজের লোকের বোনকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়িতে এলেন। তখন বড় তিন মেয়ে স্কুলে। ডাক্তারবাবুর দুপুরের ঘুম ভেঙেছে, চেম্বারে যাবেন। শিবানীমাসিমা বললেন, 'মোটামুটি চালিয়ে দেওয়ার মতো রান্না জানে। তোমার তো বিকেলবেলায় দরকার। ও একবেলা করে দেবে। কুড়ি টাকা মাইনে চাইছে। কর্তার সঙ্গে কথা বলে ওকে রেখে দাও।'

মনে মনে জিভ কাটলেন মায়াবতী। কাল থেকে কথা বন্ধ। রাত্রে মন নরম হয়েছিল, সকালে আবার গরম হয়ে গেল। তাঁর ঘুম ভাঙার আগে, কিছু না বলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেছেন। বিছানায় বসে মেজ মেয়েকে ডাকলেন চিৎকার করে, নাম ধরে। দুটো ঘর পার হয়ে আসতে নীতা ঠিক দু'মিনিট সময় নিলে রাগটা আরও বাড়ল, 'বাবা কোথায়?'

'আমি কী করে বলব?'

'যখন বেরিয়ে গেল তখন তুই দেখিসনি?'

'আশ্চর্য! ওই খাট থেকে যখন উঠে গেল তখন কেন জিজ্ঞাসা করোনি?'

'আমি কী করিনি তা তোমাকে কৈফিয়ত দেব না।'

'আমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা বলে গেল ছিটকিনিটা দিয়ে দাও।' মানুষটা ফিরে এসেছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। সঙ্গে দেড় সের ওজনের বোয়াল মাছ। বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে কেউ ওই মাছ খেত

না। এখনও খান না তিনি। কিন্তু রেঁধে দিতে হয় যে! না, তিনি ঝগড়া করেননি, কথা তুলে কথা বাড়াননি। মাঝখান থেকে রান্নার লোক রাখার ব্যাপারে কথা বলতে ভুলে গেছেন।

এই সময় ডাক্তারবাবু বাইরে বেরুবার পোশাক পরে বাইরের ঘরে এলেন। শিবানীমাসিমাকে দেখে হাতজোড় করলেন, 'কেমন আছেন?'

'হজম হচ্ছে না। খুব উইন্ড হচ্ছে।'

'ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাচ্ছেন?'

'মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।' একটু লজ্জা পেলেন শিবানীমাসিমা।

'সকালে চা বিস্কুট খাওয়ার পর এখনও তিনটের আগে ভাত নিয়ে বসেন না?

'না না। তিনটে নয়, দুটোর মধ্যে খেয়ে নিই।'

'ঠিক আছে। রেঞ্জার সাহেবকে বলবেন লোক পাঠিয়ে দিতে। ওষুধ পালটে দেব। জানি না গয়না গড়াতে গিয়ে কাল কুচবিহারের হোটেলে কী খেয়েছেন!'

শিবানীমাসিমার চোখ বড় হয়ে গেল। স্বামীর পেছন থেকে মায়াবতী তাঁকে ইশারা করলেন কোনও প্রশ্ন না করতে। যেতে যেতে এবার দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু, 'এটি কে?'

'ওই তো, ওকেই নিয়ে এলাম। মায়াবতীর পক্ষে দু'বেলা রান্না করা ঠিক হচ্ছে না। ও বিকেলের রান্না করে দেবে। কুড়ি টাকা মাইনে চাইছে। কী বলব?'

'যে পারছে না সে-ই ঠিক করুক।' ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

'দেখলেন মাসিমা, কথা বলার ধরন দেখলেন?' মায়াবতী খেঁকিয়ে উঠলেন।

'আহা। ব্যাটাছেলেরা ওইরকমই। তা গয়না গড়ার কথা বলল কেন?'

মায়াবতী মিষ্টি হাসলেন, 'আমি বলেছিলাম আপনি একা গয়নার দোকানে যাবেন তাই আমি সঙ্গে যাচ্ছি। ও ভেবেছে আপনি গয়না গড়াতে গিয়েছেন। আসলে ঠিকুজি বিচারে ওর কোনও ভরসা নেই। তা ছাড়া কালীপদ ন্যায়তীর্থ যদি আশার কথা না বলতেন তা হলে ওকে বলতে খুব কষ্ট হত।'

'অ। এই ব্যাপার। তা সন্তান তো গয়নার মতো। সে আসছে মানে গয়না গড়া হচ্ছে। এমন কিছু অসত্য বলোনি তুমি। ও যমুনা, তুমি বাপু পনেরো টাকায় রাজি হয়ে যাও। এক বেলার রান্না আর এই তো ক'টা মুখ। যখন দু'বেলা রান্না করতে হবে তখন যমুনার মাইনে পঁচিশ টাকা করে দিয়ো মায়া। যাও যমুনা রান্নাঘর দেখে আমাদের চা করে খাওয়াও।'

মায়াবতী উঠলেন, 'আহা, ও নতুন মানুষ, কোন কৌটোয় চা চিনি আছে জানবে কী করে, চলো, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি একটু বসুন মাসিমা।'

'যাও, আমি ততক্ষণ তোমাদের কলের গানের রেকর্ডগুলো দেখি।'

যমুনাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন মায়াবতী। বললেন, 'চায়ের জন্যে কাঠের উনুন জ্বালাতে হবে না। এই স্টোভটা জ্বেলে জল গরম করে নিতে পারবে?'

মেয়েটা চুপচাপ মাথা নেড়ে জানাল পারবে?

'তা হলে তুমি কি আজ থেকেই কাজে লাগবে?'

আবার মাথা নাড়ল যমুনা হ্যাঁ।

'তুমি বোয়াল মাছের কালিয়া রাঁধতে পারবে?'

'পারব।'

'সকালে মাছটা এনেছিল। আমি কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম রাত্রে করব বলে। এখন তো গরম নেই, মাছ ঠিক থাকবে। ওই যে, ওই সসপ্যানে আছে।' মায়াবতী পরীক্ষা করে খুশি হলেন, মাছ নষ্ট হয়নি। হাত ধুতেই কানে গান এল, 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ।'

ঠোঁট কামড়ালেন তিনি। শিবানীমাসিমার কি এই গান শোনা উচিত হচ্ছে? এক ছেলে নিয়ে বিধবা। সেই ছেলেকে মানুষ করেছেন। এখন না হয় বয়স হয়েছে কিন্তু প্রায় গোটা যৌবনটাই তো পুরুষসংসর্গ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। এখন কেন উনি শূন্য বাসর জাগার গান শুনবেন?

গম্ভীর মুখে মায়াবতী ঘরে ঢুকতেই শিবানীমাসি বললেন, 'কী ভাল গান রে! রবীন মজুমদারের গান আমার খুব ভাল লাগে, এটা আরও ভাল।' গান শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রটাকে থামিয়ে বললেন, বন্ধ হবে যেদিন

সব কিছু সেদিন তো দেখতে আসব না, কিন্তু তখনও তো পথের ধারে শেফালি ঝরবে। সব ঠিক থাকবে শুধু আমি না। এঃ, মনটা কীরকম বিষণ্ণ হয়ে গেল!'

শুনতে শুনতে অবাক হচ্ছিলেন মায়াবতী। এটা তা হলে দুঃখের গান? তা হলে শূন্য বাসর জাগার মানেটাও অন্য? ডাক্তারবাবু গত রাত্রে বলেছিলেন একটা আকাশের কথা, সেই আকাশ নাকি তাঁর নেই।

চা এল। মায়াবতী চুমুক দিয়ে বুঝলেন, মেয়েটার হাত ভাল।

বললেন, 'মাসিমা, ভাবছি পৃথার বিয়ে দেব। এখানে তো ভাল বাঙালি ছেলে পাওয়াই যাবে না। আর যাই হোক অবাঙালি ছেলেকে জামাই করতে পারব না। একটু দেখবেন তো!'

'কে ভাল ছেলে কি মন্দ বোঝা মুশকিল। তবে দু'জনকে জানি। একজন হল আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে, মানে আমার বড় ননদের ছেলে। বড় ননদ ছেলেটার আট বছর বয়সে মারা গেলে নন্দাই আবার বিয়ে করেন। সৎ মায়ের ভালবাসা মোটেই পায়নি ছেলেটা। আমার শ্বশুর ওকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর কাছে থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করে সেই ছেলে। তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সামান্য কেরানির চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে চাইলে ছেলেটা বাড়ি থেকে পালায়। যখন তার খবর পাওয়া যায় তখন সে এয়ার ফোর্সে ভাল চাকরি করছে। বাবাকে টাকা পাঠাতে লাগল নিয়মিত। আসা-যাওয়া আরম্ভ হল। বাবার ইচ্ছে ছেলের বিয়ে দিতে কিন্তু সৎ মা রাজি হচ্ছে না।'

'কেন?' মায়াবতী মন দিয়ে শুনছিলেন।

'কেন আবার? বিয়ে করলে, বউ নিয়ে থাকলে মাসের টাকার পরিমাণ কমে যাবে না?'

'ছেলে এখন কোথায় থাকে?'

'পুনেতে।'

'পুনে মানে?'

'ও, সে অনেক দূরে। আরব সাগরের গায়ে। ট্রেনে তিন দিন লাগে আসতে।'

মায়াবতীর মুখে হাসি ফুটল, 'বয়স কত?'

'কত হবে? আমার ননদ মারা গিয়েছে, তা ধরো, কুড়ি বছর হল। তা হলে আঠাশ।'

'আঠাশ? পৃথার থেকে বারো-তেরো বছরের বড় যে।'

'তাতে কিছু ক্ষতি নেই। দু-তিনটে বাচ্চা হওয়ার পর দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে বয়সের পার্থক্য বুঝতে পারবে না। ছেলেদের বয়স একটু বেশি হলে পরে সংসারে শান্তি থাকবে। যতটুকু জানি ছেলেটা ভাল, নেশা ভাঙ করে না।' শিবানীমাসিমা বললেন।

'একটু খোঁজ খবর যদি নেন—!'

'দ্যাখো বাপু, পুরুষমানুষের অনেকগুলো মুখ আছে। সব মুখ সমান ভাল হবে তা আশা কোরো না। এই যে দেবাদিদেব মহাদেব, কত ভাল দেবতা,অল্পেই সন্তুষ্ট, সেই তিনি মেয়েমানুষ দেখলে পাগল হয়ে যেতেন। নিজের মেয়ে মনসাকে চিনতে না পেরে পেছনে ছুটেছিলেন। তাই ছেলেদের সব দিক দেখা ভুল হবে। তুমি যদি বলো তা হলে ওর বাবার ঠিকানা এনে দিতে পারি।' শিবানীমাসিমা বললেন।

মায়াবতীর মনে বয়স নিয়ে খুঁতখুঁতানি থেকেই গিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুটি ছেলের কথা বলছিলেন, দ্বিতীয়টি কোথায় থাকে?'

শিবানীমাসিমা হাসলেন, 'আমার সঙ্গে।'

'মানে?' অবাক হয়ে গেলেন মায়াবতী।

'আমার ছেলে, অনুপ। এ ওর বিয়ে দেব ভাবছি।'

'ওমা!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন মায়াবতী।

'আমার তো পৃথাকে ভাল লাগে। বিয়ের পর ও যদি আমার ঘরে যায় তা হলে সংসারের কাজকর্ম শিখিয়ে দেব। মেয়েরা চাপে পড়লে সব করতে পারে। অবশ্য তোমাদের অনুপকে পছন্দ হবে কিনা তা জানি না। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমাকে জানিয়ো। নন্দাইকে চিঠি দিলে উনি খুশি হবেন। চলি গো, বাড়ি ফিরেই ছেলের জন্যে জলখাবার রেডি করতে হবে।'

শিবানীমাসিমা চলে গেলে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকলেন মায়াবতী, অনুপ তেমন লম্বা নয়, গায়ের রংও শ্যামবর্ণ। মুখচোখ বেশ ভাল। বদলির চাকরি ওর। প্রায় তিন বছর হল ওরা এখানে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে পৃথা

খুশিতে থাকবে। শিবানীমাসিমা ওকে আগলে রাখবেন। ডাক্তারবাবুও একদিন বলেছিলেন, 'এত রেঞ্জার এখানে এল, গেল, অনুপবাবুর মতো সৎ কাউকে দেখিনি।' শিবানীমাসিমা প্রস্তাব করেছেন শুনলে এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন ডাক্তারবাবু।

কিন্তু তারপরেই ভাবনাটা মাথায় এল। বিয়ের ক'দিন পরে অনুপ এখান থেকে বদলি হবে তা কেউ জানে না। আর বদলি হয়ে কাছাকাছি কোনও ফরেস্টে যে পোস্টিং হবে না তা কেউ বলতে পারে না, সেক্ষেত্রে মেয়ে তো সুযোগ পেলেই বাপের বাড়িতে চলে আসবে। তিনি তো শিবানীমাসিমাকে বলতে পারবেন না ওকে বাপের বাড়িতে না পাঠাতে। নাঃ, ইচ্ছে থাকলেও অনুপের সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

তার চেয়ে শিবানীমাসিমার ননদের ছেলের কথা ভাবা যেতে পারে। বয়সের পার্থক্যটা অবশ্য বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এমন কী বেশি? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য দশ বছর। এতে তো কোনও অসুবিধে হয়নি। দশে যদি না হয় বারোতে হবে কেন? হ্যাঁ, ছেলে একা থাকে, তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যাচ্ছে না, এটা একটা সমস্যা। তবে যে ছেলে প্রতি মাসে বাবা-মাকে টাকা পাঠায় সে নিশ্চয়ই বখে যাওয়া ছেলে নয়।

মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরলে পৃথাকে কাছে ডাকলেন তিনি। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল খুব লেগেছিল তোর?'

মেয়ের যেমন স্বভাব, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমার মাথাটা আচমকা গরম হয়ে গিয়েছিল। তা ওই গানটা তোর ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

'কেন ভাল লাগে?'

'সুরটা শুনলেই মনে বসে যায়।'

সুর মনে বসে যায়। মায়াবতীর কাছে কথাগুলো নতুন? বললেন, 'যা, হাতমুখ ধুয়ে নে। আজ থেকে যমুনা নামের একটা মেয়ে বিকেলের রান্না করবে। ওকে বলেছি তোদের জন্যে জলখাবার করে দিতে। খেয়ে নে তোরা।'

পৃথা চলে গেলে আবার ধন্দে পড়লেন মায়াবতী। মেয়েটা বড় নরম। অনুপের সঙ্গেই ভাল মানাত ওকে।

রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা আবার আগের মতো করলেন মায়াবতী। ছোট মেয়েকে একপাশে রেখে নিজে মাঝখানে শুলেন তিনি। ডাক্তারবাবু বিছানায় বসলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যমুনার রান্না কেমন খেলে?'

'মন্দ নয়।'

'আমার চেয়ে ভাল?'

'কেন তুলনা করছ।' ডাক্তারবাবু শুয়ে পড়লেন।

'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'শিবানীমাসিমা পৃথার জন্যে একটা সম্বন্ধ এনেছেন।'

ডাক্তারবাবু কথা বললেন না। খানিকটা অপেক্ষা করে মায়াবতী বললেন, 'ছেলে খুব ভাল। বড় চাকরি করে।'

'কোথায়? কী চাকরি?'

'এয়ার ফোর্সে। পুনে বলে একটা জায়গায় চাকরি করছে।'

'বাড়ি কোথায়?'

'অত জিজ্ঞাসা করিনি। শিবানীমাসিমার ননদের ছেলে। ওর ননদের বিয়ে হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। ছেলের যখন আট বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়।'

'বয়স কত?'

'একটু বেশি। আঠাশ।'

'অসম্ভব। এবার আমাকে ঘুমাতে দাও।' পাশ ফিরলেন ডাক্তারবাবু।

'অসম্ভব কেন?'

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন না।

'তোমার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য কত? দশ। তা হলে?'

শ্বাস ফেললেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন, 'তুমি ছেলেটাকে দ্যাখোনি, চেনো না, তার স্বভাবচরিত্র জানো না। আমি যেভাবে পৃথাকে মানুষ করছি ছেলে যদি তার উলটো হয় তা হলে মেয়েটা জ্বলেপুড়ে মরবে।'

'তা হলে বুঝতে পারছ দোষটা তোমার। তুমি যদি আর পাঁচটা মেয়ের

মতো ওকে মানুষ করতে তা হলে এই সমস্যা হত না। তা ছাড়া চোখে না দেখে শুধু বয়স শুনে তুমি কেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?' স্বামীর বুকে হাত রাখলেন মায়াবতী।

'দ্যাখো!' চোখ বন্ধ করলেন ডাক্তারবাবু।

নীতার দিকে তাকিয়ে কোনও কূল পায় না পৃথা। স্কুল থেকে ফেরার সময় একটা বুড়ো মতন লোক সাইকেলে চেপে প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে যাওয়ামাত্র পৃথা স্পষ্ট শুনতে পেল, নীতা বলল, 'শালা।'

'তুই কী বললি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল পৃথা।

'যা বলার তা বলেছি!'

'তুই গালাগাল দিলি?' বিস্ময় যাচ্ছিল না পৃথার।

'মারা উচিত ছিল। ইচ্ছে করে গায়ের কাছে সাইকেল নিয়ে এসেছিল।'

'তাই বলে ছেলেদের মতো গালাগাল দিবি?'

'মেয়েদের জন্যে কোনও গালাগাল আছে! থাকলে বল, শিখে নিচ্ছি।'

ছোট বোন মিতা চুপচাপ শুনছিল। ওর বয়স এখন সাত। একটু সরল প্রকৃতির মেয়ে। সব কথা প্রথম শোনায় সঠিক বুঝতে পারে না। সে দিদিদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হাঁটতে শুরু করেছিল পৃথা।

আজ সন্ধের মুখে পথের পাঁচালি শেষ করে দ্বিতীয়বার বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদল সে। প্রথমবার কেঁদেছিল দুর্গার মৃত্যুর সময়ে। শেষ করার পরে মনে হল, ওই নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম, মাঠ, কাশের বন, ওই আকাশ ছেড়ে যাদের চলে যেতে হয় অজানা জায়গায় তারা কেমন করে বেঁচে থাকবে? কী অসহায় মানুষগুলো যাদের নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। আর তখনই কান্না এল।

হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকে নীতা টুলের ওপর সেটা রেখে বলল, 'উঃ, আবার তুই কাঁদছিস? আচ্ছা, তুই কি কাঁদার জন্যে এইসব বই পড়িস?'

পৃথা বালিশ থেকে মুখ তুলল না। নীতা আবার বলল, 'যারা ওই বইগুলো লেখে তারা বোধহয় প্ল্যান করে লেখে!'

মুখ তুলল পৃথা, 'মানে?

'তোর মতো মানুষ কেঁদে ভাসাবে বলে গল্প সাজায়।'

'একদম বাজে কথা বলবি না। বিভূতিভূষণ কত বড় লেখক জানিস?'

'জানার দরকার নেই। তোকে দেখেই তো বুঝতে পারছি।'

পৃথা উঠে তার ছোট্ট বইয়ের র‍্যাক থেকে চাঁদের পাহাড় বইটা বের করে এনে নীতাকে দিল, 'এই বইটাও ওঁর লেখা। পড়ে দ্যাখ।'

'আমার অত সময় নেই।' বইটা সরিয়ে রাখল নীতা।

'তা থাকবে কেন? তুই একটা অশিক্ষিত।' বলেই গলা পালটাল, 'প্লিজ, আমার এই অনুরোধটা রাখ।'

ঠোঁট বেঁকাল নীতা, 'ঠিক আছে। কিন্তু মাসখানেকের আগে কোনও প্রশ্ন করবি না।'

রবিবার বিকেল তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গান শোনার সময়। বড় মেয়ের গলায় সুর আছে, কিন্তু এই ছোট্ট মফস্‌সল শহরটায় কোনও গানের স্কুল দূরের কথা, গানের মাস্টারও নেই। পঁচিশ মাইল দূরের শহরে নিয়ে গিয়ে গান শেখানো সম্ভব নয়। তাই ওকে রেকর্ড কিনে দেন ডাক্তারবাবু। শুনে শুনে ঠিক গানগুলো গলায় তুলে নেয় পৃথা। চৌকো টিনের বাক্সে থাকে বড় রেকর্ডগুলো। বাক্সের ওপর কাগজ সেঁটে গানের প্রথম লাইনগুলো লিখে রেখেছে, যাতে চট করে বের করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড বত্রিশটা, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ছ'টা, আধুনিক বাংলা গান বারোটা। আজ রবীন্দ্রনাথের গানের বাক্স বের করল পৃথা। বেছে বেছে যে গানটার ওপর চোখ রাখল সেটার গাইবার ধরন তার পছন্দ হয় না। কিন্তু ওটা ডাক্তারবাবুর খুব পছন্দের গান। রেকর্ডটা বের করল সে। তারপর গ্রামাফোন চালু করল। 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—।' গায়কের নাম কুন্দনলাল সায়গল। প্রথম দিকে খারাপ লাগত না পৃথার। কিন্তু যেদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা প্রথম কানে এল, সেদিন থেকেই সায়গলের গাওয়ার ধরন, গলা তাকে তেমন টানে না। পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া চারটে গান আছে তার সঞ্চয়ে। আছে কনক দাসের দুটো গান। কিন্তু তাঁর চেয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ওর খুব পছন্দের।

ওর এই গান শোনার সময়টায় রবিবার হলে ডাক্তারবাবু সঙ্গী হন। দু'জনে মিলে রেকর্ডের গায়ক বা গায়িকার সঙ্গে গলা মেলান। পৃথা প্রায়ই বাবাকে ধমক দেয়, 'তুমি স্কেল চেঞ্জ করছ।'

'সরি মা। বুঝতে পারি না, কখন যে চেঞ্জ হয়ে যায়!'

শিবানীমাসিমার চিঠির জবাব এল। তাঁর ননদের স্বামী লিখেছেন, প্রস্তাব শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। ছেলের বউ হিসেবে তিনি ওই বয়সের মেয়েই খুঁজছিলেন। লিখেছেন, পাত্রীপক্ষ ছেলের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার পরে সম্মত হলে তিনি মেয়েকে দেখতে আসবেন। এর পরে ছেলের ঠিকানা ইত্যাদি লিখেছেন। ছেলের নাম প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। চিঠিটা মায়াবতীকে দিলেন শিবানীমাসিমা।

ওটা পড়ার পর মায়াবতী ফাঁপরে পড়লেন, 'কী হবে? অত দূরে গিয়ে কে খোঁজখবর নেবে? ওখানে কি বাঙালি আছে?'

'কেন থাকবে না? ডাক্তারবাবুকে বলো একবার গিয়ে দেখে আসতে। যতই চাকরি করুক, ছেলে কানা খোঁড়া কিনা তা দেখবে না?' শিবানীমাসিমা চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবুকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি আঁতকে উঠলেন, 'অসম্ভব।'

'তা হলে ছেলেকে না দেখেই বিয়ে দেবে?'

'কে বলল এ কথা! অন্য জায়গায় পাত্র দ্যাখো!'

'আশ্চর্য! আমি ঘরের বউ হয়ে বাইরে পাত্র খুঁজব? কাকে চিনি আমি? তবু শিবানীমাসিমা খবরটা দয়া করে এনে দিলেন বলে—।'

'দাঁড়াও। পুনে মুম্বাইর বেশ কাছে, এখানে আমার সঙ্গে পড়ত একটি ছেলে চাকরি করে। ওকে চিঠি লিখি।'

'চমৎকার! পরের মুখে ঝাল খাবে? কীরকম বাবা তুমি?'

হঠাৎ খেয়াল হল ডাক্তারবাবুর, 'আচ্ছা, তুমি অত দূরে খোঁজ করছ কেন বলো তো? হাতের কাছে ভাল ছেলে আছে। শিবানীমাসিমাকে বলো, আমি অনুপের সঙ্গে পৃথার বিয়ে দিতে চাই। খুব ভাল ছেলে।'

মায়াবতী হাসলেন, 'আমি কি অনুপের কথা ভাবিনি? সে বিয়ে করবে না।'

'বিয়ে করবে না? কেন?'

'জানি না, শিবানীমাসিমাকে বলেছে বিয়ের প্রসঙ্গ না তুলতে।'

কথাটা অর্ধসত্য। কী করে কাছের অনুপকে বাদ দিয়ে পুনের ছেলের ব্যাপারে শিবানীমাসিমার সাহায্য নেবেন মায়াবতী! বলবেনই বা কী করে? তা হলে তো প্রকারান্তরে বলে দিতে হয়, আপনার ছেলে অনুপকে আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু এ কথা বলতে হল না মায়াবতীকে। মুখ গোমড়া করে দু'দিন বাদে এলেন শিবানীমাসিমা, বললেন, 'আমার আর সংসারে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'সব স্বার্থপর। বুঝলে! বাবার রক্ত তো ছেলে পাবেই।'

'বুঝলাম না।'

'স্বার্থপর না হলে তিনি ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে চলে যান? আমি কীভাবে জীবন কাটাব ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। এ ছেলেও হয়েছে তেমনি। মুখের ওপর বলে দিল, সরি মা, আমাকে বিয়ের কথা বলবে না। এই ভাল আছি। শান্তি নষ্ট কোরো না।'

আমি বললাম, 'বিয়ে করলে শান্তি নষ্ট হয় তা তোকে কে বলল?'

'চারপাশে চোখ মেলে তাকাও; দেখতে পাবে।' ছেলে বলল।

'ও সব বানানো কথা শুনতে চাই না। আমার বয়স হয়েছে, তোমার সংসারের ঝক্কি আর সামলাতে পারছি না। বাড়িতে বউ আনলে সে-ই দায়িত্ব নেবে, আমি বেঁচে যাব।'

ছেলে বলল, 'এ কথা গোড়াতেই বললে পারতে। রান্নার মাসিকে বলো দু'বেলা রেঁধে দিতে। আর একটা ঠিকে লোক রাখো যে বাসনমাজা কাপড় কাচা থেকে ঘরের যাবতীয় কাজ করে দিয়ে যাবে। তুমি পায়ের ওপর পা তুলে থাকবে, কোনও ঝক্কি সামলাতে হবে না।'

'মনের শান্তি? মনের শান্তি কীভাবে পাব?'

'মা, শান্তির চেয়ে স্বস্তি ঢের ভাল। এই বাড়ির বউ হয়ে যে আসবে সে যদি বলে, তোমার মাকে সহ্য করতে পারছি না, সব সময় গার্জেনগিরি করছে, তা হলে তাকে বলতে হবে, হয় সহ্য করো নয়তো বাপের বাড়িতে চলে যাও। তখন পারবে সেটা মানতে? তার চেয়ে মা-ছেলেতে বেশ

আছি। আমাকে ট্রেনিং থেকে ফেরত আসার পরে বদলি হতেই হবে। চেষ্টা করছি একটা ভাল জায়গা পেতে। বিয়ের কথা ভুলে যাও।'

'কোথায় ট্রেনিং হবে?'

'শুনেছি নাগপুরে।' ছেলে জবাব দিয়েছিল।

শিবানীমাসিমা অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, 'আগ বাড়িয়ে তোমাকে বললাম, ছেলে আমার মুখ রাখল না। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

খুব খুশি হলেও মুখ গম্ভীর রাখলেন মায়াবতী, 'আপনাকে খুব ভালবাসে।'

'বুঝলাম। আমি চলে গেলে ওর কী হবে! যাক গে, আমি আজ সকালে নন্দাইকে চিঠি লিখে দিয়েছি। ননদ মারা যাওয়ার পর যখন উনি আবার বিয়ে করলেন; তখন সম্পর্ক রাখার কথা নয়। কিন্তু ঠিকানাটা ছিল। ওরা সিলেটের মানুষ। দেশভাগ হলে শিলচরে বাসা করেছে। শিলচরের ঠিকানায় চিঠি দিলাম।' শিবানীমাসিমা বলেছিলেন।

বাইরের ঘরে বসে মিতার সঙ্গে ক্যারাম খেলছিল নীতা। প্রত্যেক গেমে হারে বলে মিতা খেলতে চায় না। মাঝে মাঝে নীতা ইচ্ছে করে খারাপ মেরে ওকে জিতিয়ে দেয় বলে খেলাটা চালু আছে। বাড়ির সামনে জিপের আওয়াজ হতে ওরা খেলা ছেড়ে বাইরে ছুটল। জিপ থেকে নেমে এল অনুপ। হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর? কেমন আছ?'

নীতা ঘাড় শক্ত করল, 'আপনি? হঠাৎ?'

'হঠাৎই চলে এলাম। বাবা বাড়িতে আছেন?'

নীতা কিছু বলার আগে মিতা বলল, 'আছে। ডেকে দিচ্ছি।'

মিতা ছুটল ভেতরে। নীতা চোখ ছোট করল, 'আপনি নাকি দিদিকে বিয়ে করবেন না?'

'মানে?'

'ন্যাকা! যেন কিছুই জানেন না?'

'বিশ্বাস করো, আমি এই প্রথম শুনছি।' অনুপ বিভ্রান্ত, 'মা কী বলেছে?'

'আপনি নাকি ভীষ্ম হয়ে থাকবেন। বিয়ে করবেন না।'

'তোমাকে কে বলল?'

'আমাকে কে বলবে? আমি শুনেছি।'

এই সময় ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন, 'আরে, এসো এসো। হ্যাঁরে, অনুপকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? ভেতরে এসে বসতে বলিসনি?'

নীতা বাড়ির ভেতরে চলে যেতে যেতে বলল, 'উনি তো আমাদের বাড়ির ভেতরে আসতে চাননি! আমি কি জোর করে নিয়ে আসব?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এসো, বসো।'

চেয়ারে বসে অনুপ বলল, 'একটা ছোট সমস্যার জন্যে এসেছি।'

'বেশ তো, বলো।'

'আমাকে ট্রেনিং-এ পাঠাচ্ছে নাগপুরে। প্রথমে জানতাম ওটা এক মাসের ট্রেনিং, এখন শুনছি পঁয়তাল্লিশ দিন থাকতে হবে ওখানে। এখানে কাজের লোকজন আছে, মায়ের কোনও অসুবিধে হবে না। তবু তো একা থাকতে হবে ওঁকে! রাত্রে কাজের লোকেরা বাড়ি চলে যায়। তাই আপনাদের কাছে এলাম, যদি দয়া করে মায়ের খোঁজখবর রাখেন।' অনুপ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল।

'অবশ্যই। তুমি না বললেও আমরা ওঁর খবর নেব। দাঁড়াও।' মুখ ফিরিয়ে ডাক্তারবাবু দেখলেন মিতা ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বললেন, যা তো, মাকে বল এখানে আসতে।' মিতা চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যাওয়া কবে?'

'চার দিন পরে। শুক্রবার।'

'নাগপুরে কখনও গিয়েছ?'

'না।'

'কমলালেবুর জন্যে এখন বিখ্যাত হয়েছে। আমি জানতাম পাহাড়ি এলাকায় কমলালেবু হয়। হয়তো সেখানে পাহাড় আছে।'

মায়াবতী এলেন, 'ওমা তুমি!'

ডাক্তারবাবু অনুপের সমস্যার কথা বললেন স্ত্রীকে। শুনে মায়াবতী বললেন, 'এটা নিয়ে তুমি একদম চিন্তা কোরো না। শিবানীমাসিমাকে

রাত্রে একা থাকতে হবে না। তুমি যে'কদিন থাকছ না, সেই কদিন নীতা ওঁর সঙ্গে থাকবে। ওখান থেকেই স্কুলে যাবে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার প্রস্তাব খুবই ভাল কিন্তু এতে শিবানীমাসিমা রাজি হবেন কিনা তা দ্যাখো!'

অনুপ বলল, 'নীতারও তো আপত্তি থাকতে পারে।'

মায়াবতী বললেন, 'ওইটুকুনি মেয়ের আবার আপত্তি! আমরা যা বলব তাই শুনবে। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ যেন?'

'আজ্ঞে, নাগপুরে।'

'নাগপুর থেকে পুনে কত দূর?' মায়াবতী সরাসরি কাজের কথায় এলেন।

'খুব বেশি দূরে নয়। এখান থেকে পুনের মাঝামাঝি। কেন?' অনুপ জানতে চাইল। মায়াবতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তুমিই বলো না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পৃথা, আমার বড়মেয়ে, বিবাহযোগ্যা হয়েছে বলে উনি মনে করছেন। তা তোমার মা একটি পাত্রের কথা বলেছেন। পাত্র এয়ারফোর্সে কাজ করে। পুনেয় থাকে। তার বাবা-মা থাকেন শিলচরে। পাত্রটি হল, তোমার মায়ের মৃত ননদের ছেলে। এখন আমাদের কর্তব্য পুনে গিয়ে তাকে দেখে আসা। না দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে তো দিতে পারি না। বুঝলে!'

মায়াবতী বললেন, 'তা ওনাকে বলছি গিয়ে দেখে এসো কিন্তু এখানকার পেশেন্টদের ফেলে উনি যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না। তুমি তো নাগপুর যাচ্ছ—।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওর ওপর দায়িত্ব দিয়ো না।' ডাক্তারবাবু মায়াবতীকে থামিয়ে দিলেন, 'যাচ্ছে অফিসের ট্রেনিং নিতে। কী করে সময় পাবে?'

'তা অবশ্য। আসলে আমাদের এত লোকাভাব।' মায়াবতী দমে গেলেন।

অনুপ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যখন খুব ছোট তখন মায়ের সঙ্গে কয়েকবার দেশের বাড়িতে গিয়েছি। হাইলাকান্দিতে। সেখানে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটা ছেলেকে দেখেছি। শুনেছি মায়ের ননদের

ছেলে। তার বাবা আবার বিয়ে করায় ওই বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে। বাবারও বদলির চাকরি ছিল। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর আর হাইলাকান্দিতে যাওয়া হয়নি। ছেলেটার নামও মনে নেই।

'প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।' মায়াবতী মনে করিয়ে দিলেও অনুপের মুখের পরিবর্তন হল না।

সে বলল, 'ঠিকানাটা দিন। আমার সঙ্গে যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে সেই বাহানা নিয়ে গিয়ে দেখেও আসতে পারি। তিন দিন ম্যানেজ হয়তো করতে পারব।'

আলাদা কাগজে প্রণবকুমারের ঠিকানা লিখে দিলেন মায়াবতী।

উঠে দাঁড়াল অনুপ, 'কিন্তু আমার ওপর এত বড় দায়িত্ব দেওয়া কি ঠিক হবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুরুটা তুমিই করো। একটা কথা মনে রেখো। পৃথা খুব নরম মনের মেয়ে। গান-কবিতাই ওর প্রাণ। সাংসারিক প্যাঁচ ও বোঝে না। ছেলেটি যদি কড়া বাস্তববাদী হয় তা হলে ওর সঙ্গে সম্বন্ধ না করাই ভাল।'

মায়াবতী প্রতিবাদ করলেন, 'তুমি আগেভাগে ওর মনে এ সব ঢোকাচ্ছ কেন? ও দেখে আসুক। তারপর ওর মুখে সব শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

অনুপ বলল, 'আমি জেনে আসব উনি কবে শিলচরে যাচ্ছেন। আপনারা সে সময় গেলে ওঁদের সবাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। চলি।'

'আরে! যাচ্ছ কেন? একটু চা খেয়ে যাও।' মায়াবতী বললেন।

'আমি চা খাই না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

অনুপ চলে যাওয়ার পর ডাক্তারবাবু বললেন, 'একেই বলে হিরের টুকরো ছেলে। অন্য নেশা দূরের কথা, চা পর্যন্ত খায় না।'

'ও যদি বিয়ে করতে না চায় তো আমি কী বলব?'

'কেন চাইছে না সেটা জানা দরকার ছিল! পৃথা ও বাড়িতে গেলে কখনওই তোমার শিবানীমাসিমার সঙ্গে কোনও ঝামেলা করবে না।' ডাক্তারবাবু বললেন।

'হয়তো শারীরিক অসুবিধে আছে।' ঠোঁট মোচড়ালেন মায়াবতী।

'মানে?'

'আঃ। নিজে ডাক্তার হয়ে বোঝো না কোন শারীরিক অসুবিধে থাকলে ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না! সেই অসুবিধের কথা নিজের মাকেও বলা যায় না।' মায়াবতী ভেতরে চলে গেলেন।

পরীক্ষা চলছিল। নীতা বা মিতার আজ ছুটি। খুব ভাল লিখতে পেরেছে বলে পৃথা ছুটির পর খুশিতে মশগুল হয়ে বাড়ি ফিরছিল। পেছনে জিপের আওয়াজ হচ্ছে খেয়াল করেনি। খেয়াল হতেই রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। জিপটা একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়াল। পৃথা দেখল অনুপ নেমে আসছে। সে কি করবে ঠাওর করতে পারছিল না।

'তুমি এই ভাবে রাস্তায় চলো নাকি!' অনুপ একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসল।

পৃথা জবাব না দিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

'বোন কোথায়?'

'বাড়িতে।'

'আমার ওপর তোমার বাবা মা কী দায়িত্ব দিয়েছেন জানো?'

মাথা নেড়ে না বলল পৃথা।

'তুমি জানো না কিন্তু আমি নিশ্চিত, তোমার বোন জানে।' তিন পা এগিয়ে এল অনুপ, 'তুমি হয়তো আমাকে ভুল বুঝেছ! তোমার বোন আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি তোমাকে কেন বিয়ে করলাম না! এরকম যে কথা উঠেছে তাই আমি জানতাম না। বিশ্বাস করো। তোমাকে নয়, আমি কাউকেই বিয়ে করার কথা ভাবি না। আর হ্যাঁ, তোমাকেও বলি, তুমি তো এবার ফাইনাল দিচ্ছ, এখনই বিয়ে করবে কেন? পড়াশুনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের কথা ভাবা উচিত। আচ্ছা, চলি।' জিপে উঠে অনুপ চলে গেল।

হঠাৎ পৃথার মনে হল এমন কথা তাকে কেউ বলেনি। পড়াশুনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ালে স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। কিন্তু তাদের পরিবারের কোনও মহিলা তো চাকরি করে না। বাবা বা মায়ের দিকে সবাই সংসার সামলায়। সে যদি ব্যতিক্রম হতে চায় তা হলে মা-বাবা মেনে নেবে? মা মানবে না কিছুতেই কিন্তু বাবাকে সে বলতেই পারে।

হাঁটতে হাঁটতে অনুপকে ভালমানুষ বলে মনে হল। বাবা মা ওঁকে কী দায়িত্ব দিয়েছে!

বাড়িতে ঢোকার আগেই নীতাকে দেখতে পেল সে। ছোটরা ফুটবল খেলছে আর ও বাঁশি নিয়ে রেফারিগিরি করছে। ওকে দেখে নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'পাশ করবি তো?'

মুখ বেঁকাল পৃথা, 'আমি কখনও ফেল করেছি?'

নীতা খেলা থামিয়ে কাছে এল, 'একবার কর না। তা হলে আমার সুবিধে হয়।'

'কী সুবিধে?'

'তা হলে আমি ফেল করলে মা-বাবা কিছু বলতে পারবে না।' বলে হাসল নীতা।

পৃথার মনে পড়ে গেল, 'অ্যাই, তুই কি জানিস, বাবা মা শিবানীদিদিমার ছেলেকে কী দায়িত্ব দিয়েছে?'

'জানি তো। পুনেয় গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেখে আসতে?'

'সে আবার কে?'

'তোর ভাবী বর যাকে জামাইবাবু বলতে হবে আমাকে।'

'ভ্যাট।'

'লোকটা নিজে বিয়ে না করে আর একজনের কাঁধে তোকে চাপিয়ে দিতে চাইছে।' কথাগুলো বলে নীতা আবার খেলার মধ্যে ফিরে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে গ্রামাফোন মেশিনটার সামনে চুপচাপ বসে ছিল পৃথা। নীতা এমনভাবে বলল যেন সে একটা বোঝা। একজনের কাঁধ থেকে আর একজনের কাঁধে পাঠানো হচ্ছে। ও দিকের ঘর থেকে মায়ের গলা ভেসে এল, 'পৃথা।' সে ঘোর থেকে বেরিয়ে ঝটাপট আধুনিক গানের বাক্স থেকে একটা রেকর্ড বের করে চালিয়ে দিল। রেকর্ডটা কার তা দেখার সময় ছিল না যেন। শচীন দেববর্মনের গান বাজল, 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে...।'

মাসখানেক পরে শিবানীমাসিমা ছেলের লেখা চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিটা মায়াবতীকে পড়ে শোনালেন তিনি। অনুপ লিখেছে, পরপর তিন দিন ছুটি

থাকায় পুনে গিয়েছিলাম। যেহেতু তোমার ননদের ছেলে তাই প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার কাকা হন। উনি থাকেন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে, মেসে। আমি উঠেছিলাম হোটেলে। সেখান থেকে টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বলি। প্রথমে চিনতে পারছিলেন না। তোমার নাম বললেও প্রথমটায় বুঝতে পারেননি। পরে বোঝার পরে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। প্রণবকা লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। এক ইঞ্চি কম হতে পারে। এয়ারফোর্সে কাজ করলে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয় বলে ওঁর শরীরে মেদ নেই। প্রতিবছর কুড়ি দিনের জন্যে শিলচরে যান। বাংলা বলেন তবে ইংরেজি বলার দিকে বেশি ঝোঁক। গায়ের রং বেশ ফরসা। পাত্র হিসেবে আর কী কী দেখতে হয় জানি না। এককথায় সুদর্শন মানুষ বলেই মনে হয়। এত দিন পরে কেন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছি জানতে চাইলে আমি সত্যি কথা বলতে বাধ্য হলাম। উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাদের তো বদলির চাকরি। বেশিরভাগ জায়গা বাংলার বাইরে। এয়ারফোর্সের সঙ্গে যুক্ত কোনও পরিবারের মেয়ে যেভাবে মানাতে পারবে বাইরের মেয়ের পক্ষে সেভাবে মানানো সম্ভব নয়। তবে যেহেতু মা-বাবা জীবিত তাই তাঁর কর্তব্য থেকে যাচ্ছে। ওঁর বাবা বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছেন বলে উনি বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছেন, পৃথার ব্যাপারে উনি শিলচরে ওঁর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। এর পরে আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলা গান-কবিতা ইত্যাদি উনি ভালবাসেন কিনা। উনি বললেন, বাংলা গান শোনার কোনও সুযোগ পান না। কবিতা তাঁর কোনও দিনই তেমন ভাল লাগে না। ছেলেবেলায় খুব শ্যামাসংগীত শুনতেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনি উনি কোনও নেশা করেন কি না। যা হোক, ওঁর বাবার ঠিকানা পাঠালাম। আর একটা খবর; সামনের মাসে উনি শিলচরে যাবেন।'

শিবানীমাসিমা বললেন, 'কোনও ছাঁদছিরি নেই লেখার। ভাল লোককে তোমরা পাত্র দেখতে পাঠিয়েছ। তবে অন্য সূত্রে খবর পেলাম বাবা-মায়ের ওপর প্রণবের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। আমি বলি কি চিঠি লিখে তোমরা দু'জনে শিলচর থেকে ঘুরে এসো।'

'দু'জনের যাওয়া সম্ভব নয়। এই বাড়ি, মেয়েদের রেখে যাওয়া যাবে

না। ওদের বাবাকে বলি গিয়ে দেখে আসতে। চিঠি পড়ে ছেলে সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হল?'

'শ্যামাসংগীত শুনত যখন তখন মনটা নরম ছিল। এয়ারফোর্সে কাজ করতে করতে অবাঙালিদের সঙ্গে থেকে একটু কাঠখোট্টা হয়ে যেতেই পারে। তবে অনুপ যখন সুদর্শন বলেছে তখন ধরে নিতে পারো খুব ভাল দেখতে।'

রাত্রে স্বামীকে বললেন মায়াবতী। অনুপ যা লিখেছে হুবহু তাই বললেন তিনি। কোনওরকম রং চড়ালেন না। শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'মনে হচ্ছে ছেলে খারাপ নয় তবে পৃথার উপযুক্ত না।'

'কেন? তোমার মেয়ে কি স্বর্গের অপ্সরা?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। পৃথা কখনওই শ্যামাসংগীত শোনেনি। ও বরাবর কাব্যসঙ্গীতের ভক্ত। ওইটুকু মেয়েকে যদি শ্যামাসংগীত শুনতে হয়—!'

'কে বলেছে শুনতে হবে। কবে কোন ছেলেবেলায় প্রণবকুমার ওসব শুনেছে, ভুলেই মেরে দিয়েছে। তুমি কবে যাবে বলো?'

'বেশ বলছ যখন—!' ডাক্তারবাবু বাধ্য হয়ে বললেন।

'তুমি চিঠি লেখো, সামনের মঙ্গলবার যাবে। মঙ্গলে উষা, বুধে পা।'

পরের মঙ্গল বা বুধবারে নয়, ডাক্তারবাবুর চিঠির উত্তর শিলচর থেকে এল পনেরো দিন পরে। প্রণবকুমারের বাবা প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাস্তি খুশি হইলাম। যাঁহার মারফত আপনি আমাদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবেন।

হয়তো আপনি জানেন তবু কর্তব্যজ্ঞানে আমাদের পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। আমার পূর্বপুরুষ অধুনা পূর্ব পাকিস্তানে বাস করিতেন। তাঁহারা বিশাল স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশভাগের সময়ে অস্থিরতা এমন প্রবল হইল যে প্রায় একবস্ত্রে আমরা ভারতের শিলচরে চলিয়া আসি। ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করিবার প্রয়াস চালাইতেছি। অবশ্য আমার এক কাকা এখনও সেখানেই বাস করিতেছেন।

আমার পুত্র শ্রীমান প্রণবকুমারের বাল্যকাল তাহার মাতামহের সংস্পর্শে অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমানে সে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে অফিসারের পদে প্রমোশন পাইয়াছে। আপনি জানেন তাহার কর্মস্থল পুনেতে। প্রণবকুমারের বয়স আঠাশ বছর তিন মাস। সে আগামী সপ্তাহে কুড়ি দিনের ছুটিতে শিলচরে আসিতেছে। ওই সময়ে যদি আপনি আমার গৃহে পদধূলি দেন তা হলে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইতে পারে। অনুগ্রহ করিয়া আপনার কন্যার একটি সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফ সঙ্গে আনিবেন।

অধিক আর কী! আপনি আমার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করিলে ধন্য হইব।

ইতি, প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়।'

চিঠিটি পড়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'লোকটা যেমন নিজের স্ত্রীর কথা লেখেনি তেমনি তোমাকেও শুভেচ্ছা জানায়নি। এখনও যে কেন মানুষ সাধুভাষায় চিঠি লেখে!'

একজন পুরুষমানুষ আর একজন পুরুষমানুষকে চিঠি লিখছেন, এর মধ্যে বাড়ির মেয়েদের টেনে আনবেন কেন?' মায়াবতী বললেন, 'তুমি কালই মেয়েকে নিয়ে শহরে যাও। ধরাধরি করলে সকালে ছবি তুলে বিকেলে দিয়ে দেবে।'

'ও বাব্বা, থামওয়ালা বারান্দার বিশাল ছবি পেছনে টাঙিয়ে ওরা ছবি তোলে। কীরকম বানানো বলে মনে হয়।'

'তা হলে ছবি কোথায় পাবে?'

'দাঁড়াও, আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পরের দিনই ক্যামেরা কিনে আনলেন ডাক্তারবাবু। শাটার টিপতেই নাকি ছবি ওঠে। দূরত্ব মাপতে হয় না, লেন্স ঘোরাতে হয় না। বাড়িসুদ্ধ সবার ছবি তোলার পর নীতা প্রায় ছিনিয়ে নিল ক্যামেরা, 'এবার আমি তুলব। বাবা, মায়ের পাশে দাঁড়াও। আর সব সরে যাও। এই মিতা, সরে যা মায়ের কাছ থেকে।'

মায়াবতীর আপত্তি সত্ত্বেও ছবি তোলা হয়ে গেল। মেয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্যামেরা হাতে। গোরু ছাগল থেকে আকাশ, যার দিকে তাকাচ্ছে তারই ছবি তুলছে। শেষতক আর শাটার কাজ করছিল না। বাবার কাছে চলে

এল নীতা, গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ক্যামেরা এনেছ, কাজই করছে না।'

ক্যামেরা পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, কী করে করবে, ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে।'

'আর একটা ফিল্ম নিয়ে এসো!'

'আনব। তার আগে দেখব এই ছবিগুলো কেমন উঠল।'

পরের দিন ছবি প্রিন্ট হয়ে এলে দেখা গেল, পৃথার চোখজুড়ানো ছবি তুলেছেন ডাক্তারবাবু।

গুয়াহাটিতে ট্রেনেই পৌঁছানো যায়। গুয়াহাটি থেকে শিলং হয়ে বাসে লম্বা যাত্রা। গায়ে হাতে পায় ব্যথা হয়ে যায়। ওঁরা সন্ধের মুখে পৌঁছালেন শিলচরে। শহরে যখন বাস ঢুকেছিল তখন বেশ হতাশ হয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। এত নাম শুনেছিলেন শহরটার কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে নেহাতই পরিকল্পনাবিহীন পাতি মফস্‌সল জনপদ। রাস্তার ধুলো বাতাস বইলেই উড়বে নিশ্চয়ই।

ডাক্তারবাবু একা আসেননি। তাঁর চেম্বারে আড্ডা মারতে কয়েক জন প্রৌঢ় রোজ আসেন। তাঁদের একজনের নাম নিবারণ মালাকার। খুব রসিক মানুষ। সরকারি চাকরি করতেন, দু'বছর হল অবসর নিয়ে মেয়েজামাই-এর কাছে আছেন। পুত্রসন্তান নেই, স্ত্রী গত হয়েছেন সাত বছর আগে। ওপার বাংলার বাড়ি ছিল। প্রবাসে জীবন কাটালেও মাতৃভাষাটা ভোলেননি বলে দাবি করেন। মালাকার মশাইকে প্রস্তাবটা দিতেই এক পায়ে রাজি হয়ে গেলেন। অন্য আড্ডাধারীরা বললেন, 'খুব ভাল হল। বিয়ে বলে কথা, একা সিদ্ধান্ত নিতে নেই।'

বাস থেকে নেমে নিবারণ মালাকার বললেন, 'ওহে ডাক্তার। কথায় আছে বিয়ের পরে কুটুমবাড়িতে তেরাত্তিরের বেশি কাটাতে নেই। বিয়ের আগে কী বিধান তা জানা আছে?

'আজ্ঞে, তা তো জানি না।'

'আমার মনে হয় রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে উড বি বেয়াই বাড়িতে হানা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' নিবারণ মালাকার বললেন।

'আমিও তাই ভেবেছি।'

শিলচর শহরে সে সময় ভাল হোটেল ছিল না। মোটামুটি যে হোটেলে ওঁরা উঠলেন সেখানে না উঠে উপায় নেই বলেই ওঠা। কিন্তু রাতের খাবার খেতে বসে নিবারণ মালাকার উল্লসিত, 'আরে। এ তো দিশি রান্না! অপূর্ব, অপূর্ব!'

ডাক্তারবাবু অবশ্য এত উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারছিলেন না। যে লোকটি পরিবেশন করছিল তাকে নিচু গলায় কিছু বললেন নিবারণ মালাকার। লোকটি গিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে এল। দু'জনের কিছু বাক্যবিনিময়ের পর নিবারণ মালাকার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুঁটকি চলবে? অমৃত।'

'আজ্ঞে না। আপনি খাবেন নাকি?'

'বাসনা হচ্ছে।'

'জ্যান্ত মাছ থাকতে মানুষ শুঁটকি খেত না। বছরের একটা সময়ে যেহেতু জ্যান্ত মাছ পাওয়া যেত না তাই ওই সময়ে খাওয়ার জন্যে মাছগুলোকে শুঁটকি বানিয়ে রাখা হত। এখানে তো জ্যান্ত মাছই রয়েছে।' ডাক্তারবাবু বললেন।

'দূর। শুঁটকির স্বাদই আলাদা।'

'আমার তো গন্ধেই বমি হয়ে যায়।'

'যাচ্চলে। পাশে বসে বমি করলে আমি খাব কী করে?'

'আপনি খান। তাতে কোনও অসুবিধে নেই।'

খেয়ে তৃপ্ত হলেন নিবারণ মালাকার।

ঘরে ফিরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যান্টাসিড গোছের কিছু খাবেন?'

'কেন? ও হো! পাগল নাকি! হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি ডাক্তার।'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে তাকালেন। নিবারণ মালাকার বললেন, 'তোমার দৌলতে অনেক বছর পরে শুধু প্রিয় খাবার খেলামই না, মায়ের ভাষায় কথা বললাম। আমরা কী বললাম তা নিশ্চয়ই ভাল বুঝতে পারোনি।'

ডাক্তারবাবু হাসলেন, 'আপনাদের কথাবার্তা শুনলে রবীন্দ্রনাথ নিজের লাইনগুলো আবৃত্তি করতেন, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।'

শোওয়ার পরে একটা চিন্তা প্রবল হওয়ায় ঘুম আসছিল না ডাক্তারবাবুর। পাত্রের বাবা প্রাণকুমার লেখেননি তাঁরা বাড়িতে কী ভাষায় কথা বলেন! এই শিলচরের আশিভাগ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন। বাড়িতে তাঁদের ভাষায় কথা বলাই স্বাভাবিক। তা হলে ওই বাড়িতে বিয়ে হলে পৃথার কী হবে? বেচারা একটা কথাও বুঝতে পারবে না। ভাষা না বুঝলে অশান্তি হবেই। ইশারা ইঙ্গিতে যদি বোঝায় তা সব সময় ঠিকঠাক বুঝতে পারবে? যদি দয়া করে ওর সঙ্গে কথ্য বাংলায় কথা বলে তা হলে ভাল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সেটা বলবে কেন? হঠাৎ মায়াবতীর ওপর রাগ হল তাঁর। জোর করে ঠেলে পাঠাল তাঁকে। ব্যাপারটা নিয়ে একটুও ভাবল না। মেয়েকে সাততাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্যে যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কে বলবে পৃথা ওর নিজের পেটের মেয়ে!

সকালে চা খেতে খেতে নিবারণ মালাকারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা বাড়িতে কী ভাষায় কথা বলেন?'

নিবারণ অবাক হলেন, 'কেন? বাংলা। তবে জামাইয়ের প্রবণতা আছে ইংরেজি বলার।'

'বাংলা মানে, পূর্ববঙ্গের ভাষায়?'

'না না।' হেসে ফেললেন নিবারণ, 'আমার স্ত্রী গোয়ালপাড়ার মেয়ে। সে বুঝতেই পারত না, বলা দূরের কথা। মেয়েও তাই। আসলে ভাষাটা যে একদম আলাদা তা নয়। উচ্চারণের জন্যে অবোধ্য বলে মনে হয়।'

একটু স্বস্তি পেলেন ডাক্তারবাবু। প্রণবকুমার তো চাকরি সূত্রে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে। প্রবাসীদের সঙ্গে মিশছে। তাদের মধ্যে বাঙালিও নিশ্চয়ই আছে। তাদের সঙ্গে কথ্য বাংলাতেই বলতে অভ্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

নিবারণ মালাকার হোটেলের ম্যানেজারের কাছে ঠিকানা দেখিয়ে বাড়ির হদিশ জেনে নিলেন। জানলেন মুখার্জি পরিবারের দুটো বড় স্টেশনারি

দোকান রয়েছে। রিকশায় উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা যে যাচ্ছি তা ওঁরা জানেন?'

'ওঁর চিঠি পেয়েই আমি লিখেছিলাম আজ সকাল দশটা নাগাদ যাব।'

'পোস্টঅফিসের যা অবস্থা, চিঠি না লিখে টেলিগ্রাম করে দেওয়া উচিত ছিল।'

বেশিরভাগ বাড়ির ছাদ টিনের। কাঠের বাড়িও চোখে পড়ছে। নিবারণ মালাকার বললেন, 'শহরের বাইরেটা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ভেতরটা তার ঠিক উলটো। যাক গে, কত উঠবে ভেবে রেখেছ তো?'

'উঠব মানে?'

'দেনাপাওনার কথা বলছি। ওঁরা যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল চান আমরা কত অবধি বলতে পারি?'

'যৌতুক দিতে হবে নাকি?' চমকে গেলেন ডাক্তারবাবু।

'কোন বাঙালি মেয়ের যৌতুক না দিয়ে বিয়ে হয়েছে বলে জানো?'

'হ্যাঁ। আমি। আমার শ্বশুরমশাইকে একপয়সা যৌতুক দিতে হয়নি।'

'একজনই প্রহ্লাদ হয়, বাকি সব দৈত্যসন্তান। কথা তুললে কী বলবে?'

'না না। আমি মেয়েকে যেভাবে বড় করছি তাতে যৌতুকের প্রশ্ন ওঠে না।'

'বেশ। এটাই আমাদের বক্তব্য। ওঁরা যদি যৌতুকের কথা না বলেন তা হলে আমরা যেচে বলব না। তবে নিজে থেকে পাত্রকে কিছু দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই দেব। ঘড়ি, আংটি, বোতাম, জামাকাপড়, যা দেওয়া উচিত সব দেব। মেয়েকেও সাজিয়ে দেব যাতে বিয়ের কনে বলে মনে হয়।' ডাক্তারবাবু বললেন।

রিকশাওয়ালাকে বলা ছিল। সে একটা টিনের গেটওয়ালা বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে বলল, 'দেখুন।'

গেটের গায়ে একটা ফলকে লেখা আছে, প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

ডাক্তারবাবু ভাড়া মেটাতেই বাগানের ওপারে বারান্দায় একজন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। ধুতির ওপর গেঞ্জি পরা মানুষটির বয়স ষাটের ওপরে। গেটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের পরিচয়?'

নিবারণ মালাকার বললেন, 'ইনি ডাক্তার তপনজ্যোতি চক্রবর্তী, আমি নিবারণ মালাকার।'

'আসুন আসুন। আমি প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়। আপনার লেখা চিঠি কাল বিকেলে পেয়েছি। সঙ্গে সুটকেস নেই? কোথায় রেখে এলেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমরা কাল রাত্রে পৌঁছেছি। তখন আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি বলে হোটেলে উঠেছি।'

'ছি ছি। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে হোটেলে উঠলেন কেন? আর এই শহরের হোটেলের যা চেহারা! নাঃ, কাজটা ভাল করেননি।'

নিবারণ মালাকার বললেন, 'আফশোস করবেন না। সম্পর্ক যদি তৈরি হয় তখন দেখবেন এত ঘনঘন আসব যে আপনারা হাঁপিয়ে উঠবেন।'

প্রাণকুমার ওঁদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন। বারান্দা দিয়ে না এসে পাশের খিড়কি দিয়ে একটা বড় নিকানো উঠোনে ঢুকে প্রাণকুমার বললেন, 'এই আমার বাড়ি। মোট পাঁচটি শোওয়ার ঘর ছাড়া ওই দিকে রান্নার ঘর, খাওয়ার ঘর, উঠোনের এপাশে কুয়ো, নলকূপ, মেয়েদের স্নানের জায়গা, পায়খানা। আসুন বারান্দায় বসি।'

পাশের বারান্দায় চারটে বেতের চেয়ার এবং বেতের টেবিল সাজানো ছিল। সেগুলোতে বসার পর প্রাণকুমার বললেন, 'দেশের বাড়িতে যা ছিল তা মনে করতেই বুকে যন্ত্রণা হয়। প্রায় শূন্য হাতে এসে অনেক লড়াই করে এটুকু করতে পেরেছি। যাক গে, আসতে তেমন কষ্ট হয়নি তো?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পথ দীর্ঘ, এ ছাড়া কিছু নয়।'

নিবারণ মালাকার সুর করে বললেন, 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কি মেটে মনোরথ?'

প্রাণকুমার জোরে হাসলেন, 'বাঃ, আপনি তো বেশ রসিক মানুষ। আপনার সঠিক পরিচয় জানলাম না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ। সরকারি অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করে আমাদের সঙ্গ দেন। এখানে একা আসব, তাই ওঁকে বলতে উনি দয়া করে রাজি হয়ে গেলেন।'

'এসে লাভ বই লোকসান তো হচ্ছে না।'

ডাক্তারবাবু লক্ষ করছিলেন এ বাড়ির কাউকে বারান্দায় দেখা যাচ্ছে

না। মহিলা দূরের কথা, কোনও শিশুও চোখের সামনে আসছে না।

'আপনার মেয়ের বয়স ষোলো। উপযুক্ত বয়স। ছবি এনেছেন?'

'হ্যাঁ।' বুকপকেট থেকে খাম বের করে এগিয়ে ধরলেন ডাক্তারবাবু।

সেই খাম থেকে ছবি বের করে মাথা নাড়লেন প্রাণকুমার, 'বাঃ। গায়ের রং কি একটু চাপা? ছবিতে বোঝা যায় না।'

'গৌরবর্ণ নয়, তবে অতি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।'

'আমার ছেলে আবার বংশছাড়া রং পেয়েছে। সাহেবদের মতো।' হাসলেন প্রাণকুমার, 'আপনার মেয়েকে আমার ভাল লেগেছে। এখন বাড়ির মহিলারা কী বলেন দেখি!'

প্রাণকুমার গলা তুললেন, 'হরিহর।'

উঠোনের ওপাশ থেকে হাফপ্যান্ট পরা একটি কিশোর উঁকি মারল।

'এদিকে আয়।'

কিশোর এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালে তার হাতে খাম দিলেন প্রাণকুমার, 'ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখা।' কিশোর পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার চার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'এটি বড়?'

'হ্যাঁ।

'কী পড়ছে?'

'এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। টেস্ট হয়ে গেছে।'

'ভাল। মা যদি সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা না দিতে পারে তা হলে—। যাক গে! আপনারা কি পূর্ববঙ্গের মানুষ?'

'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন যশোরের লোক।'

'যশোরকে তো পূর্ববঙ্গ বলা যায় না।'

এবার দেখা গেল দু'জন কাজের মহিলা দুটো ট্রে হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাদের পেছনে অনেকটা ঘোমটা দিয়ে বাইরে বেরুবার শাড়ি পরে একজন মহিলা। দাসীরা ট্রে দুটো নামিয়ে চলে গেলে দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ, রসগোল্লার সঙ্গে লুচি তরকারি কয়েকটা প্লেটে উপচে পড়ছে।

প্রাণকুমার বললেন, 'খেয়ে নিন।'

নিবারণ মালাকার মাথা নাড়লেন, 'অসম্ভব। এত মিষ্টি খেতে পারব না।'

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা?'

নিবারণ বললেন, 'হ্যাঁ, চা খাব।'

মহিলা চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, 'সত্যি অসম্ভব হবে এত খাওয়া। তা ছাড়া নিবারণদার সুগার আছে। এত মিষ্টি খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তুলে নিয়ে যেতে বলুন।'

'থাক, শরীর যদি খারাপ হয় তা হলে ওসব খাওয়ার দরকার নেই। কয়েকটা লুচি খেয়ে নিন। চা আসছে।'

মিনিট পাঁচেক বাদে চা এল। মহিলা এসে খাম ফেরত দিয়ে স্বামীকে বললেন যা তা আন্দাজে বুঝলেন ডাক্তারবাবু। মেয়ের ছবি দেখে সবাই খুশি হয়েছে। তবে ছবিটা রেখে দিতে হবে। ছেলে আজ আসছে। তাকে তো দেখাতে হবে। প্রাণকুমার মাথা নাড়লেন। স্ত্রী চলে গেলে বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন ওঁর কথা?'

'খানিকটা।'

'আপনার মেয়েকে সবার পছন্দ হয়েছে। তবে ছবিটা রাখছি ছেলের দেখার জন্যে।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু ছবি দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমাদের বাড়িঘরও সেই সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।' ডাক্তারবাবু বললেন।

'তা তো বটেই। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

'কীরকম?'

'প্রণব বছরে একবার ছুটি পায়। আমি যদি আপনার মেয়ের ছবি আগে দেখতাম তা হলে ওকে লিখতাম এখন ছুটি না নিতে। সে আজ এখানে আসছে। তার মানে হল আগামী এক বছরে সে আসতে পারবে না। অর্থাৎ বিয়ের জন্যে আমাদের আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ তো। আমার আপত্তি নেই।'

'আমার আছে। সামনের বছরে আপনার মেয়ে কলেজে পড়বে। প্রণবেরও বয়স এক বছর বাড়বে। আমি এই কারণে বেশ কিছু পাত্রী

দেখেছি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ও যখন আসছে তখন এই ছুটিতেই ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'

'সে কী!' চমকে গেলেন ডাক্তারবাবু।

'এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। কিছু কেনাকাটা, লোক ডেকে অতিথিদের খাওয়ানো। এই তো।'

নিবারণ মালাকার চুপচাপ শুনছিলেন, বললেন, 'ব্যাপারটা অত সরল নয়। গয়নাগাঁটি গড়ানোর ব্যাপার আছে, আত্মীয়স্বজন যাঁরা দূরে থাকেন তাঁদের নেমন্তন্ন করে আনতে হবে। তা ছাড়া একটা মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে।'

'কার?' প্রাণকুমার তাকালেন।

'সবার। বিশেষ করে মেয়ের।'

'আপনার সঙ্গে একমত হলাম না। বালিকা বয়সেই মেয়েরা জেনে যায় তাকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে। ওই প্রস্তুতি ট্রস্তুতি দরকার হয় না। অবশ্য আর্থিক কারণে যদি আপনি সক্ষম না হন তা হলে অন্য কথা!'

ডাক্তারবাবু সোজা হলেন, 'দেখুন, আমি অবশ্যই অক্ষম নই। কিন্তু বিয়ের খরচ তো কম নয়, এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।'

'দেখুন, এ ব্যাপারে কথা বলা আমার উচিত নয়। আপনারা যদি না পারেন তা হলে আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে।' প্রাণকুমার গম্ভীর।

নিবারণ মালাকার বললেন, 'আপনার ছেলের পছন্দ অপছন্দ—।'

'ওটা নিয়ে ভাববেন না। সে আমার মুখের ওপর কথা বলে না।' একটু থেমে প্রাণকুমার বললেন, 'আমি বিয়ের দিনও ঠিক করে রেখেছি। ঠিক পনেরো দিন পরে গোধূলি লগ্নে বিয়ে হতে পারে। ওহো, মেয়ের জন্মমাস কী?'

'কার্তিক।'

'বাঃ। তা হলে তো কোনও বাধা রইল না। বাড়ির মহিলারা মনে করেন যে জন্মমাসে বিয়ে দিতে নেই। আপনি যদি রাজি থাকেন তা হলে আমি আমার এক দুঃসম্পর্কের ভাইকে যেতে বলব আপনার বাড়িতে।

সে কুচবিহারে থাকে। ভারী সাংসারিক বুদ্ধি তার। সে নিজের চোখে দেখে আমাকে জানালে আর কোনও অস্বস্তি থাকবে না।' হাত নাড়লেন প্রাণকুমার।

নিবারণ মালাকার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে তো পছন্দ হবেই, শুনেছি আপনার ছেলে সুদর্শন, চরিত্রবান। যদি আমরা এই সময়ের মধ্যে কাজটা করতে সক্ষম হই তা হলে আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয়।'

'বলুন, কী বিষয়?'

'আমরা আমাদের মেয়েকে সাধ্যমতো সাজিয়ে দেব। কিন্তু পাত্রের কোনও বিশেষ ইচ্ছে আছে কিনা তা জানি না।'

'ওহো, আপনি দেনা-পাওনার কথা বলছেন?'

'কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই তো ভাল।' নিবারণ মালাকার বললেন।

'ওটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

কথায় কথায় বেলা বাড়ছিল। ডাক্তারবাবুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। প্রাণকুমার জোর করাতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। নিবারণ মালাকারও বললেন, 'মফস্‌সলের মানুষ, তার ওপর পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন, দুপুরে থাকলে না খাইয়ে ছাড়বেন না।'

মধ্যাহ্ন ভোজন অতি তৃপ্তি করে খেলেন নিবারণ মালাকার। দু'রকমের শুঁটকির পরে চিতলমাছের বড় পেটি, বোয়ালমাছ, মাংস, কোনওটাতেই তিনি না বলেননি। ডাক্তারবাবু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নামমাত্র খেলেন।

বিদায় নেওয়ার আগে প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাতের আহারের ব্যবস্থা কি করতে পারি?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমরা আজ সন্ধের বাসেই ফিরে যাব।'

'ওহো!' প্রাণকুমার মাথা নাড়লেন, 'তা হলে মতামতটা জানিয়ে যাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

রিকশা ডেকে আনল কাজের লোক। তাতে ওঠার পর প্রাণকুমার একটা মুখবন্ধ খাম ডাক্তারবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা লেখা আছে তার সবটাই দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যেটা পারবেন সেটা জানালেই হবে।'

রিকশা চলল। ওঁরা কেউ কথা বলছিলেন না। নীরবতা ভাঙলেন নিবারণ মালাকার, 'কী হে ডাক্তার, পনেরো দিনে তৈরি হতে পারবে?'

'তার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু—।'

'অস্বস্তি হচ্ছে?'

'কয়েকটা কারণে।' ডাক্তারবাবু চোখ বন্ধ করলেন, 'ছেলে-মেয়ে কেউ কাউকে দেখল না। আমিও পাত্রকে দেখিনি। যা অনুপ বলেছে তাই শুনেছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, এতক্ষণ ওই বাড়িতে থাকলাম, একমাত্র প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মহিলাকে দেখলাম না। তিনিও ঘোমটায় মুখ প্রায় ঢেকে ছিলেন। বাড়িতে কি আর কোনও মহিলা নেই? তিন, ভদ্রমহিলা যে কয়েকবার মুখ খুলেছেন ততবার অন্যরকম ভাষা বেরিয়েছে। তার মানে ওঁরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ওই ভাষায় কথা বলেন। আমি তো ভাবতে পারছি না, পৃথা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে আছে। ওর সঙ্গে ওই ভাষায় কথা বললে বিন্দুমাত্র বুঝবে না। তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না, এত মশলা এবং ঝাল দেওয়া রান্নায় মেয়ে একদম অভ্যস্ত নয়।'

নিবারণ মালাকার শুনছিলেন, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সামনের রিকশার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো তো ডাক্তার।'

ডাক্তারবাবু দেখলেন, সুদর্শন একটি যুবক পায়ের সামনে বড় সুটকেস নিয়ে রিকশায় বসে আছে। রিকশাটা তাঁদের পাশ দিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। নিবারণ মালাকার বললেন, 'এই ছেলেটির নাম প্রণব নয় তো। আজই তার আসার কথা।'

ডাক্তারবাবু কিছু বলার আগেই রিকশাওয়ালা বলল, 'আপনারা যে বাড়ি থেকে বের হলেন সেই বাড়ির ছেলে। বিদেশে চাকরি করে।'

'বাঃ।' নিবারণ মালাকার হাসলেন, 'আমাদের পাত্র দেখা হয়ে গেল।'

ডাক্তারবাবু চলন্ত রিকশায় বসে পেছনে তাকালেন। এভাবে যুবককে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। বললেন, 'দেখতে তো ভালই লাগল।'

'ভাল বললে কম বলা হবে ডাক্তার। রাজপুত্রের মতো দেখতে।'

হোটেলের ঘরে ঢুকে খামটা খুললেন ডাক্তারবাবু। তারপর এগিয়ে দিলেন, 'আপনিই পড়ুন। আমার মাথা কাজ করছে না।'

নিবারণ মালাকার কাগজটা বের করে পড়লেন, ওপরে লেখা আছে আনুমানিক ব্যয়। হাসলেন তিনি, 'ভাল। হ্যাঁ। এক, মোট তিরিশজন বরযাত্রীর যাতায়াতের খরচ। দুই, তাদের আপ্যায়ন এবং থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্তের খরচ। তিন, বউভাতের খরচ বাবদ কুড়ি হাজার নগদ টাকা। খাট পালঙ্ক আলনা—লাগিবে না। চার, পাত্রের জন্যে ঘড়ি, সোনার বোতাম, পাঞ্জাবি, ধুতি এবং সুটের কাপড়। পাঁচ, উনচল্লিশটি নমস্কারি শাড়ি। আলমারি ইত্যাদি ভারী জিনিস—লাগিবে না। পাত্রীকে এমনভাবে সাজাইয়া দিতে হইবে যাতে এই পরিবারের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। ছয়, যেসব বস্তু লাগিবে না তাহা এই কারণে যে পাত্রের কর্মস্থলে বহন করিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। ওই সব বস্তুর উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিলেই চলিবে।' মুখ তুললেন নিবারণ মালাকার, 'ব্যস। আর কিছু চাইছেন না এঁরা।'

চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন ডাক্তারবাবু, এবার চোখ খুললেন, 'কত দাঁড়াল?'

'মনে হয় পঞ্চাশের মধ্যেই হয়ে যাবে।' নিবারণ মালাকার কোনও হিসেব না করে বললেন।

'আমার আরও তিনটি মেয়ে আছে।'

'এমনিতে মনে হবে বেশি কিছু চাইছেন না। কিন্তু ওই মূল্য ধরে দেওয়া ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। ধরুন, আপনি একটা পছন্দসই আলমারি কিনে দিলেন। কিন্তু ওঁদের কিনতে দিলে হয়তো দ্বিগুণ দামের আলমারি পছন্দ করবেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পছন্দের উনিশবিশ হতেই পারে কিন্তু আমার খারাপ লাগছে, প্রাণকুমারবাবু নগদ কুড়ি হাজার চাইছেন কী করে? আমার মেয়ে ওঁর বাড়িতে বউ হয়ে গেলে তাকে উপলক্ষ করে যে অনুষ্ঠান তিনি করবেন তার খরচ আমাকে দিতে হবে কেন? ওঁরও তো কর্তব্য থাকছে, সেটা কোথায় গেল!'

নিবারণ খানিকটা চিন্তা করে বললেন, 'যাওয়ার আগে তো জানিয়ে যেতে হবে? উনি দেনা-পাওনার কথা মুখে না বলে কাগজে লিখে খামে ভরে দিলেন। হয়তো তিনি চক্ষুলজ্জা এড়ালেন। দ্যাখো ডাক্তার, এর মধ্যেই আমরা দুটো পক্ষ হয়ে গিয়েছি। ওঁর ত্রুটি দেখে আমাদের খারাপ

লাগছে। তাই বলি, এখনই আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নেব না। ওঁকে জানিয়ে দেব যে ফিরে গিয়ে তুমি শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে ওঁকে জানিয়ে দেবে।'

'বেশ। তাই করুন।'

'তুমি যদি মেয়ে না দিতে চাও তো মিটে গেল, যদি শেষ পর্যন্ত আপত্তি না করো তা হলে এখনই বিয়ে দেওয়ার সময় থাকবে না। সেক্ষেত্রে ওঁরা রাজি থাকলে এক বছর পরে হবে, তুমিও এক বছর সময় পাবে। তবে একটা কথা, কখনওই ওঁর সঙ্গে দরাদরি করবে না। এটা কমান, ওটা কমান বলবে না।' নিবারণ মালাকার পরামর্শ দিলেন।

প্রস্তাবটা পছন্দ হল ডাক্তারবাবুর। মনে মনে ভাবলেন, এক বছর পিছিয়ে যাওয়া মানে অনেক সময় পাওয়া। তত দিন মেয়েটা কলেজে ভরতি হয়ে যাবে। হয় গুয়াহাটি নয় কলকাতায়। একবার পড়া শুরু হয়ে গেলে ওর ইচ্ছের ওপর বিয়ের ব্যাপারটা তিনি ছেড়ে দেবেন, ওর মা যাই বলুক না কেন! এরকম ভাবতেই বেশ হালকা বোধ করলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, 'তা হলে খবরটা পাঠিয়ে দিন, কিন্তু কীভাবে পাঠাবেন?'

নিবারণ মালাকারের হস্তাক্ষর মুক্তোর মতো। তিনি লিখলেন যে মনস্থির না করতে পেরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে বাড়িতে আলোচনা করবেন। করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানিয়ে দেবেন। লিখে ডাক্তারবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে খাম চেয়ে নিয়ে তার ওপর ঠিকানা লেখার পর ভদ্রলোককে অনুরোধ করলেন কাউকে দিয়ে প্রাণকুমারবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে। ম্যানেজার যাতায়াত ভাড়া বাবদ দুটো টাকা চেয়ে নিলেন।

রাত আটটা নাগাদ বাস ছাড়ে। ওঁরা সাড়ে সাতটায় সেখানে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণকুমারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ব্যাগ।

হেসে বললেন, 'আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রীর জন্যে একটু ফলমিষ্টি পাঠিয়েছেন।'

ডাক্তারবাবু বিব্রত বোধ করলেন, 'এসবের কী দরকার ছিল।'

'মহিলাদের মন কীসে তৃপ্ত হয় তা পুরুষদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।'

'ওঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' ডাক্তারবাবু বললেন।

'আপনি ডাক্তারবাবুর চিঠি পেয়েছেন?' নিবারণ মালাকার জিজ্ঞাসা করলেন।

'ডাক্তারদের হাতের লেখা দুর্বোধ্য হয়। কিন্তু আপনার হস্তাক্ষর অপূর্ব। পেয়েছি। ওহো, আমার ছেলে আজ বাড়ি ফিরেছে। আপনার মেয়ের ছবি দেখে সে তার মাকে বলেছে আমাদের অপছন্দ না হলে তার আপত্তি নেই। আমাদের তো পছন্দ হয়েই আছে। একটা কথা, আপনাকে যে তালিকা দিয়েছি তাতে বউভাতের খরচ বাবদ কুড়ি হাজার টাকা ধরা ছিল। তার অর্ধেক দিলেই চলবে কারণ ছেলে বলছে খরচটা পনেরো হাজারের মধ্যেই রাখতে হবে এবং সে বাকি পাঁচ হাজার এ বাবদ দেবে। কিন্তু চিঠি নয়, আপনি কাল পৌঁছাবেন, পরশু এই নম্বরে টেলিফোন করে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবেন। নইলে আয়োজন করা সম্ভব হবে না। আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রাণকুমারবাবু ব্যাগটা ডাক্তারবাবু হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। বাসে ওঠার পর নিবারণ মালাকার বললেন, 'অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।'

'দেখছি তাই।'

'তবে নির্বোধ গোঁয়ারদের চেয়ে বুদ্ধিমান বাস্তববাদী ঢের ভাল।'

'কী করা উচিত বলুন তো!'

'দেখুন মেয়ের বিয়ে আজ নয় কাল দিতেই হবে। চাপ যখন কমে গেল তখন রাজি হয়ে যান। রিকশায় বসা ছেলেটিকে যেটুকু দেখেছি জামাই হিসেবে খুবই গ্রহণীয়।'

নিবারণ মালাকারের কথাগুলো খুবই সত্যি। কিন্তু মন থেকে অস্বস্তি যাচ্ছিল না ডাক্তারবাবুর। পৃথা এ বাড়ির বউ হলে ওইভাবে ঘোমটা দিয়ে থাকবে? ও তো শাশুড়ির একটাও কথা বুঝবে না! তার চেয়ে বাড়িতে গিয়ে বলবেন, পাত্র পছন্দ হয়নি। মেয়েটা পড়ুক।

কিন্তু মায়াবতী তাঁর স্বামীকে চেনেন। জেরা করে করে সত্যি কথাটাকে বের করে এনে অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কী! মেয়েটা ভাল থাক, সুখে থাক তা চাও না?'

'আমি কবে চাইলাম না?' অবাক হলেন ডাক্তারবাবু।

'তা হলে মুখ ব্যাজার করে অপছন্দের কথা বলছ কেন? কোনটা তোমার অপছন্দ?'

'ভাষা। ওদের ভাষা পৃথা বুঝতেই পারবে না।'

'তুমি কী করে বুঝলে?'

'আমি তো প্রাণকুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমার সঙ্গে মাতৃভাষা বলেননি। কিন্তু ওঁর স্ত্রী বলেছেন।'

'দু'দিন লাগবে বুঝতে। মেয়েরা হল জলের মতো। যে পাত্রে রাখবে তাতেই মানিয়ে নেয়। ওরকম রূপবান স্বামী, সচ্ছল শ্বশুরবাড়ি পাওয়া ভাগ্যের কথা। তা ছাড়া প্রণব নিশ্চয়ই বউকে বাপ-মায়ের কাছে ফেলে রাখবে না! তা হলে চিন্তা কীসের?'

এসব কথা বলে মায়াবতীর শান্তি হল না। নীতাকে পাঠিয়ে নিবারণ মালাকারকে ডাকিয়ে এনে জানলেন আপত্তি করার তেমন কোনও কারণ নেই। জানার পর অনুরোধ করলেন, 'আপনি ওঁকে নিয়ে একবার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে ফোনটা করে আসুন। ওঁকে একা ছাড়তে ভরসা হচ্ছে না, কী বলতে কী বলে আসবে।'

ডাক্তারবাবু বাধ্য হলেন নিবারণ মালাকারের সঙ্গী হতে।

অনেক চেষ্টার পর লাইন পেয়ে প্রাণকুমারবাবুর খোঁজ করতে ওদের জানানো হল তিনি অনেকটা দূরে থাকেন। তবে বলে গিয়েছেন আপনারা সম্মত আছেন কি না তা জেনে নিতে। ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সম্মত আছি। ওঁদের বলবেন যোগাযোগ করতে।'

নিবারণ মালাকার ভরসা দিলেন। সবাই মিলে হাত লাগালে শুভকাজ সুসম্পন্ন হবে।

আজ চেম্বারে যেতে ইচ্ছে হল না ডাক্তারবাবুর। রাত জেগে বাসে এসে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখলেন মায়াবতী বাড়িতে নেই। তিনি যে বিকেলে শিবানীমাসিমার বাড়িতে যাবেন তা বলে রেখেছিলেন।

ডাক্তারবাবু কান খাড়া করলেন। না, রেকর্ড বাজছে না। অথচ দিনের এই সময়টায় পৃথা গ্রামাফোনে রেকর্ড বাজিয়ে শোনে। তিনি গ্রামাফোনের

ঘরে ঢুকে দেখলেন পৃথা দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে আছে। নীতা বা মিতা ওর কাছে নেই। পাশে গিয়ে তিনি বললেন, 'কী রে, এইভাবে বসে আছিস কেন?'

মেয়ে মুখ তুলল না। ডাক্তারবাবু ওর পাশে বসে মাথায় হাত রাখলেন, 'তোর কি আমার ওপর রাগ হয়েছে?'

মেয়ে মাথা নেড়ে না বলল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমাদের দেশে মেয়েদের একটা বয়সের পরে শ্বশুরবাড়িতে যেতেই হয়। এটা নিয়ম। বাবা-মা চেষ্টা করে সেই বাড়িটা যাতে মেয়ের বাসের উপযুক্ত হয়। আমি তোকে খারাপ জায়গায় নিশ্চয়ই পাঠাব না!'

এবার মুখ না তুলে পৃথা কথা বলল, 'আমি কলেজে পড়তে চাই।'

'বেশ তো!' বলেই থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু। তারপর একটু ভেবে যোগ করলেন, 'আমি ওঁদের বলব তোকে কলেজে পড়াতে।'

'তুমি না শুনলে ওরা শুনবে কেন?' কেঁদে ফেলল পৃথা।

কোনও উত্তর দিতে পারলেন না ডাক্তারবাবু। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর পৃথা সোজা হয়ে বাবার হাত ধরল, 'তুমি বলেছিলে স্বাবলম্বী না হলে সারা জীবন পরাধীন হয়ে থাকতে হয়। তুমি বলোনি?'

'বলেছি। আমি তাই বিশ্বাস করি মা!'

'তা হলে?'

'আমি প্রণবের সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন? বিভূতিভূষণ?'

'এয়ার ফোর্সে চাকরি করে। তুই যদি সাহায্য করিস তা হলে নিশ্চয়ই পড়বে।'

এই সময় নীতা ঘরে ঢুকল। ঢুকে চোখ বড় করল, 'অ্যাই দিদি, তুই আবার কাঁদছিস? কেঁদে কোনও লাভ হবে না। তার চেয়ে বরং এই ক'দিনে কয়েকটা রান্না শিখে নে। নইলে পুনে গিয়ে বিপদে পড়বি।'

ডাক্তারবাবু চুপচাপ উঠে গেলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের পাশে দু'মিনিট বসতে পারেননি। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত হতে হয়েছিল। বুক মুচড়ে গেলেও কাজগুলো করতে হয়েছিল। এটা সেই রকমই।

ক'দিন যেন ঝড় বয়ে গেল। টেলিফোনে খবর পাওয়ার তিনদিনের মাথায় প্রাণকুমার তাঁর নিকট দুই আত্মীয়কে নিয়ে হাজির হলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। রবিবার। সকাল সাড়ে আটটায় চেম্বারে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। রান্নার মেয়েটা তখনও আসেনি। ডাক্তারবাবুকে জলখাবার করে দিতে রান্নাঘরে হিমশিম খাচ্ছিলেন মায়াবতী। নীতা এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দরজায়, 'তিনটে লোক এসেছে।'

'চেম্বারে যেতে বল।'

'ওরা পেশেন্ট নয়। বলল, তোমাদের খবর দিতে।'

'তোর বাবাকে বল।'

'বলেছি।' মেয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

বিরক্ত হলেন মায়াবতী। এখন তাঁর মরার সময় নেই আর নীতা গেল রহস্য করে। ঠিক তখনই ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন, 'তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটাও।'

'মানে?' হাঁ হয়ে গেলেন মায়াবতী।

'আরে ওঁরা এসেছেন। না বলে কয়ে, বাস থেকে নেমে সোজা চলে এসেছেন। আমি বাইরের ঘরে বসিয়েছি।' বলে আবার যেভাবে এসেছিলেন সেভাবে চলে গেলেন।

বাইরের ঘরে ঢোকার আগে নীতাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তারবাবু নিচু গলায় বললেন, 'নিবারণ জেঠুর বাড়িতে গিয়ে বল তাড়াতাড়ি আসতে। বলবি প্রাণকুমারবাবু এসেছেন।'

'কোন জন প্রাণকুমার?'

'ওঃ, তোর জেনে কী লাভ! তাড়াতাড়ি যা।'

প্রাণকুমারবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে আচমকা আসার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে আমরা দিনহাটায় যাব। ওখানে আমার এক কাকা থাকেন। নব্বুই-এর কাছে বয়স। দুপুরের আহার তাঁর ওখানে সেরে আবার সন্ধের বাস ধরব কুচবিহার থেকে। মেয়ের মা, মেয়ে কোথায়?'

'আসছে। আমি যদি একটু আগে জানতে পারতাম আপনারা আসছেন—।'

প্রাণকুমারবাবুর এক সঙ্গী বললেন, 'এখন এলে মেয়েকে আটপৌরে, মানে, স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। তাই—।'

দ্বিতীয়জন বললেন, 'সময় অসময় বিচার করবেন না। ক'দিন পরে দুই বাড়ির লোক এক হয়ে যাবে। আগে জানলে আপনি আমাদের জন্যে ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা রাখতেন। আমরা আপনার ঘরের খেলে বেশি খুশি হব।'

মায়াবতী এলেন। মাথায় ঘোমটা টেনে। ডাক্তারবাবু লক্ষ করলেন এটুকু সময়ের মধ্যে শুধু পোশাক পালটানো নয়, মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিয়েছেন মায়াবতী।

আলাপ হওয়ার পর প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তারবাবুর কাছে তো আমার বাড়ির খবর পেয়েছেন। কোনও প্রশ্ন থাকলে বলুন।'

ঘোমটা আর একটু সামনে টেনে মায়াবতী বললেন, 'সবই তো খুব ভাল শুনলাম। অনেক যত্ন করেছেন আপনারা।'

'আর কিছু?'

স্বামীর দিকে তাকালেন মায়াবতী। ডাক্তারবাবু হাসলেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু নিবারণদা বলে পেরেছেন। আপনার স্ত্রীর কথা বলছি।'

সুযোগ পেয়ে মায়াবতী বললেন, 'উনি কি ওই ভাষায় কথা বলেন?'

'নিজেদের মধ্যে আমরা ওভাষায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। তবে এটা কোনও সমস্যা নয়। চলতি বাংলা বলতে সবাই সক্ষম। এবার মেয়েকে ডাকুন।'

মিনিট আটেক পরে মায়াবতী মেয়েকে নিয়ে এল। আসার আগে পইপই করে যা যা করতে হবে বলে বুঝিয়েছিলেন। মেয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ঘরে ঢোকার পর সে সবাইকে প্রণাম করাতে মায়াবতী খুশি হলেন।

প্রণাম সেরে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল পৃথা। প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'তুমিই পৃথা?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পৃথা।

'কার নামে নাম তা নিশ্চয়ই জানো?'

আবার মাথা নাড়ল পৃথা।

'ফাইনাল পরীক্ষা কবে?'

'দেড় মাস বাকি আছে।' পৃথা কথা বলল।

'পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'হ্যাঁ।'

প্রাণকুমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা ওকে প্রশ্ন করবেন?'

প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী কী রাঁধতে জানো?'

পৃথা জবাব দিল না। প্রাণকুমার হাসলেন, 'মাংসটা রাঁধতে পারো। তাই না? পড়াশুনা করছে, রান্না শেখার সময় কোথায়?'

প্রথমজন বললেন, 'এখন দরকার হবে না। তবে প্রণবের কাছে গেলে তো তাকে রেঁধে খাওয়াতে হবে।'

দ্বিতীয়জন বললেন, 'অনেক পরের ব্যাপার। তার আগে শাশুড়ির কাছে শিখে নেবে।'

প্রাণকুমার বললেন, 'আমরা আর কোনও প্রশ্ন করব না। আমি চাই, তুমি আমাদের প্রশ্ন করো। জানতে চাও।'

পৃথা আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'যা জানতে চাস, বল।'

পৃথা বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝের ওপর চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ওখানে কলেজ আছে?'

'আছে।'

'আমি কি সেখানে পড়তে পারি?'

'ভেবে দেখব। আর কিছু?'

মাথা নাড়ল পৃথা। আর কোনও প্রশ্ন নেই।

পকেট থেকে একটা ভেলভেটের বাক্স বের করলেন প্রাণকুমার। তারপর নরম গলায় বললেন, 'এদিকে এসো।'

অবাক হল পৃথা। মায়াবতী বললেন, 'ডাকছেন, যাও।'

কয়েক পা এগিয়ে সামনে দাঁড়াল পৃথা।

বাক্সটা খুলে একটা মাঝারি সাইজের হার বের করে প্রাণকুমার

মায়াবতীর দিকে তাকালেন, 'ওকে এটা পরিয়ে দিন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'একী? এখনই কেন?'

'আশীর্বাদ করে গেলাম। সব কিছু পাকা হয়ে গেল। এক লক্ষ শব্দ লিখে যা হয় না, এতে তা হয়। পরিয়ে দিন।' প্রাণকুমার বললেন।

মায়াবতী হার পরাতে পরাতে নিচু গলায় বললেন, 'প্রণাম কর।'

পৃথা নিচু হল। পায়ের আঙুলগুলো ছোঁয়া শেষ হতেই প্রাণকুমার বললেন, 'যাও, ভেতরে যাও।'

প্রাণকুমারের প্রথম সঙ্গী বললেন, 'চমৎকার মানিয়েছে হারটা।'

প্রাণকুমার বললেন, 'হারের তো প্রাণ নেই, তাই অসুবিধেও নেই।'

বরযাত্রীরা অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছিল। বিয়ের আয়োজনে কোনও খুঁত থাকলেও তা চোখে পড়েনি। বাড়ির সামনে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছিল যেখানে পাড়ার মানুষ, বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজন ছাড়াও ডাক্তারবাবুর পেশেন্টেরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সবাই বলেছিলেন পাত্র অত্যন্ত সুপুরুষ কিন্তু বিয়ের কনেকেও দেখে চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না।

রাত কাটিয়ে পাত্রপক্ষ কনেকে নিয়ে ফিরে গেলেন স্বস্থানে। পৃথার বাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সবাই সজল চোখে উপস্থিত ছিল শুধু ডাক্তারবাবুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যখন ধানচাল দিয়ে জন্মের ঋণ শোধ করানোর আয়োজন চলছে তখন থেকে তিনি আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। প্রাণকুমার শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন, 'এই আচারটি থাক। মা-বাবার ঋণ কোনও ভাবেই শোধ করা যায় না।'

সঙ্গে সঙ্গে মায়াবতীকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল পৃথা। কেঁদেছিলেন মায়াবতীও। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মিতাও। কিন্তু নীতা কাঁদেনি। গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'অ্যাই দিদি, কাঁদছিস কেন? তুই তো চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছিস না। আবার যখন আসবি তখন তো হাসতে হাসতে আসবি। তোর একটা বাড়ি ছিল, এখন দুটো বাড়ি হল। চুপ কর। চল, গাড়িতে ওঠ।'

প্রাণকুমার সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ, চমৎকার বলেছে!'

ওরা চলে গেল।

তবু কিছু ভিড় ছিল। শেষ পর্যন্ত সংবিৎ ফিরে পেয়ে মায়াবতী নীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখ তো, তোর বাবা কোথায়?'

'জানি না!'

'খুঁজে দেখতে বলছি। মেয়ের চলে যাওয়া আমরা সবাই সহ্য করতে পারলাম আর উনি পারলেন না! অদ্ভুত!'

দুপুরের মুখে ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন নিবারণ মালাকারের সঙ্গে। ডাক্তারবাবু নিজের ঘরে চলে গেলে নিবারণ মালাকার মায়াবতীকে বললেন, 'খুব ভেঙে পড়েছেন উনি। পৃথাকে খুউব ভালবাসেন। ওর চলে যাওয়াটা দেখতে চাননি, মনে করেছেন, সহ্য করতে পারবেন না। আপনি এ নিয়ে ওঁকে কিছু বলবেন না।'

কথা রেখেছিলেন মায়াবতী। এখনও আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ এই বাড়িতে, পাশের বাড়ির বাড়তি ঘরে, পি ডব্লু ডি বাংলোতে, নিবারণ মালাকার মশাইয়ের বাড়িতে থেকে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে বিকেল-সন্ধেতে কথা বলেছেন। ওঁদের অনেকেই আগামী কাল চলে যাবেন। কয়েক জন বউভাতে যাওয়ার জন্যে থেকে যেতে চান। পরের দিন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে একজন এসে খবর দিয়ে গেল, ফোন এসেছে, বরযাত্রীরা পাত্র-পাত্রীকে নিয়ে পৌঁছে গেছে। কোনও অসুবিধে হয়নি।

তবু খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না ডাক্তারবাবুর। মায়াবতী নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে খাওয়ালেন। রান্নার ঠাকুর যে খারাপ রাঁধেনি জেনে খুশি হয়েছেন। আর সেসব চুকতে চুকতে মধ্যরাত হয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে গা ধুয়ে তিনি যখন শোয়ার ঘরে ঢুকলেন তখন রাত একটা। ঘুমন্ত ছোট মেয়েকে বিছানার এক পাশে টেনে রেখে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে স্বামীর পাশে গিয়ে শুলেন তিনি। শুয়েই বুঝতে পারলেন ডাক্তারবাবু জেগে আছেন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে স্বামীর বুকের কাছে সরে এলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

শ্বাস ফেললেন ডাক্তারবাবু, কিছু বললেন না।

বাজুতে গাল রেখে বললেন মায়াবতী, 'পৃথা যখন পৃথিবীতে আসার জন্যে হাঁসফাঁস করছিল তখন আমার শরীরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। লোকে

বলে, ওটাকেই প্রসবযন্ত্রণা বলে। কিন্তু ও যেই আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এল তখনই দেখলাম ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দূর হয়ে অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে গেল। তুমি আজ সেটাই ভাবছ না কেন? ওকে তুমি ধীরে ধীরে বড় করেছ জীবনের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে যাওয়ার জন্যে। আজ সুন্দরভাবে সে সেই জায়গায় চলে গেল। এতে তো তোমার খুশি হওয়া উচিত। তাই না?'

'হুঁ। কিন্তু—!'

'তুমি ওর বাবা, আমি মা নই?'

'তোমার মন অনেক শক্ত!'

'না। মোটেই না। তুমি তাই ভাবো।' মায়াবতী স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। এবং তখনই ডাক্তারবাবুর আবিষ্কার করলেন যে মায়াবতীর শরীরে শাড়ির নীচে কোনও অন্তর্বাস নেই। তার শরীরের গরম স্পর্শ তাঁর শরীরকে আক্রমণ করল। নিজের সঙ্গে লড়াই শুরু হল তাঁর। বললেন, 'থাক। সরে শোও।'

'না!'

'তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'একদম না।' স্বামীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন মায়াবতী। উন্মাদিনীর মতো নিজেকে বিবস্ত্র করছিলেন একই সঙ্গে।

'প্লিজ ভেবে দ্যাখো—।'

'আমি যা ভাবার তা ভেবে নিয়েছি।'

'শোনো। আমাদের পর পর চারটে মেয়ে হয়ে গেছে—।'

'পঞ্চমবারে ছেলে হবে।'

'দ্বিতীয়বার থেকে এ কথা আমরা ভেবেছি।'

'এবার সেই ভাবনাটা সত্যি হবে। আমি সন্তান চাই।'

'চার চারটে মেয়ে পেয়েও তোমার সাধ মিটছে না?'

'না। আমার একটা ছেলে চাই।'

'লোকে কী বলবে। একটু দাঁড়াও। উঃ।'

'কে কী বলছে আমি কেয়ার করি না। যে চোখের সামনে থাকলে অস্বস্তি হত সে আজ অনেক দূরে চলে গিয়েছে।'

'কিন্তু মায়া—, তুমি ভুল করছ।'

'মোটেই না। তুমি দেখো, এবার আমার ছেলে হবেই।'

আর প্রতিরোধ করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না ডাক্তারবাবুর। তবু মিনমিনে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে বুঝলে?'

'আগে এসো।' মায়াবতীর গলা জড়িয়ে গেল।

মিনিট দুয়েক পরে স্বামীর পাশে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেন মায়াবতী। ডাক্তারবাবুও নিস্তেজ, কথা বলছিলেন না।

মায়াবতী ফিসফিস করে বললেন, 'এবার আমার ছেলে হবে।'

ডাক্তারবাবু সাড়া দিলেন না।

'তোমাকে বলা হয়নি। আমি শিবানীমাসিমার সঙ্গে কুচবিহারে গিয়েছিলাম। উনি গয়না কিনতে যাননি। গিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে বিখ্যাত জ্যোতিষী কালীপদ ন্যায়তীর্থের কাছে। তিনি ঠিকুজি বিচার করে বলেছেন আমার পঞ্চম সন্তান অবশ্যই ছেলে হবে।'

'অদ্ভুত!'

'মানে?'

'তুমি এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করলে কী করে?'

হাসলেন মায়াবতী, 'গাছের পরিচয় কীসে বল তো?'

'পাতায়, ফলে।' ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন।'

'ঠিক। কিন্তু গাছের পরিচয় শেকড়েও। মাটির তলায় যেসব কচু হয়, যেমন মানকচু, শোলাকচু, পঞ্চমুখী কচু। ওপরের পাতা দেখে তুমি আলু বললে। কিন্তু মাটির তলায় সেটা রাঙালু, মিষ্টি আলু না গোল আলু তা মাটি খুঁড়ে না দেখে বলবে কী করে? তাই তোমার জানার বাইরে অনেকে কিছু আছে যা তুমি জানো না।' মায়াবতী হাসলেন।

শাশুড়ি যখন বরণ করে পৃথাকে ঘরে তুলেছিলেন তখন আর সন্ধে নেই। দীর্ঘ বাসযাত্রায় পৃথার পাশে বসেছিল বরযাত্রী হয়ে আসা প্রাণকুমারবাবুর ভাইয়ের মেয়ে, সে খুব সতর্কভাবে কয়েকবার মুখ খুলেছিল। জল তেষ্টা পেয়েছে কিনা, খিদে পেয়েছে কিনা অথবা কোথাও বাস থামলে জানতে

চেয়েছে বাথরুম যাবে কিনা। প্রতিটি প্রশ্ন বুঝতে সময় লেগেছে পৃথার। মেয়েটি দু'-তিনবারে প্রতি শব্দ ব্যবহার করায় অর্থ বুঝে পৃথা মাথা নেড়ে না বলেছে। বাস বরযাত্রীতেই ভরা ছিল। বাড়তি কয়েকজন নতুন বউয়ের মুখ দেখতে উদগ্রীব ছিলেন, তাঁদের আশা পুরোটা পূর্ণ হয়নি।

বাস থেকে নেমে যাত্রীদের যে প্রতীক্ষালয়টি রয়েছে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাসযাত্রার কারণে ম্লান হয়ে যাওয়া পৃথার প্রসাধন, পোশাক যথাযথ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাণকুমার। তাঁর ভাইঝি তৎপর হয়েছিল।

বরণ করার সময় রাত হলেও, পাড়ার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। চিবুক স্পর্শ করে প্রণবকুমারের মা যে কথা বললেন তা কানেই ঢুকল না পৃথার। সঙ্গে আসা মেয়েটি ইশারায় বুঝিয়ে দিল কী কী করতে হবে। সেসব করার পর যে ঘরটিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, পরে সে জেনেছে সেটি তার এবং প্রণবকুমারের শোওয়ার ঘর।

রাত্রের খাওয়া শেষ হলে, নতুন বাড়িতে পরার জন্যে কেনা শাড়ি পরে যখন পৃথা বিছানায় বসল তখন কয়েকজন মহিলা হাসাহাসি করে বললেন, 'আজ কালরাত্রি। বরের সঙ্গে শুলে পাপ হবে। কাল থেকে তো শোবেই।'

শেষ পর্যন্ত ঘর ফাঁকা হল। একা হতেই বাবার মুখ মনে পড়ল পৃথার। ওই বাড়ি থেকে তার বেরুবার সময় বাবা সামনে আসেনি। নিশ্চয়ই তার জন্যে খুব কেঁদেছে বাবা। আশ্চর্য ব্যাপার। তার চলে আসার দৃশ্য যদি বাবা দেখে সহ্য না করতে পারে তা হলে এত ছুটোছুটি করে বিয়ে দিতে গেল কেন? ভাবতেই তার শরীর ঝাঁকিয়ে কান্না এল।

এই সময় একজন অল্পবয়সী মহিলা পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী লো, মন খারাপ করছে?'

নিজেকে সামলাল পৃথা। মহিলা বলল, 'এই প্রথম বাড়ির বাইরে থাকা, তাই তো?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পৃথা।

'তা হলে কান্না পাওয়া স্বাভাবিক। নাও শুয়ে পড়ো। অনেকটা পথ বাসে এসেছ, শুলেই ঘুম এসে যাবে। এদের কথা তুমি বুঝতে পারছ না বলে আমার ওপর ভার পড়েছে তোমার পাশে শোওয়ার।' মহিলা বলল।

পৃথা তাকাল। এই মহিলাকে সে বাসে দ্যাখেনি।

'কী দেখছ? ভাবছ আমি কে?' মহিলা হাসলেন, 'আমার নাম পূর্ণিমা। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের অনেক দূরের সম্পর্কের এক ভাইয়ের মেয়ে। মা-বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকো ডুবে মারা যাওয়ায় উনি আমাকে এ বাড়িতে আনেন চার বছর বয়সে। ভগবান যখন শত্রুতা করে তখন তাঁর মাত্রাজ্ঞান থাকে না। বাপ-মাকে কেড়ে নিয়ে শান্তি হল না, নয়-দশ বছরেই এত রূপ দিল যে পাড়ার পুরুষদের চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। আমাকে বাঁচাতে তোমার শ্বশুর পনেরো বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিল আলিপুরদুয়ারের এক মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। সেখানেই তো তোমাদের বাংলাটা শিখে ফেললাম।' পূর্ণিমা হাসল। পৃথা মুগ্ধ হয়ে দেখল গজদাঁতটাকে। নীচের পাটিতে।

'আপনারা বাঙালি নন?' প্রথম কথা বলল পৃথা।

'ও মা! বাঙালি নই কে বলল? ও, বুঝতে পেরেছি। সব বাঙালি তো এক ভাষায় কথা বলে না। যে যেখানে থাকে সেখানকার মতো করে কথা বলে। আলিপুরদুয়ারে আমাদের বাড়ির পাশে যারা থাকত তারা মালদহের লোক। বাংলা কথা বলত সুর করে করে। নাও, শুয়ে পড়ো। আমারও ঘুম পেয়েছে।' বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল পূর্ণিমা। পৃথার মনে হল মহিলার লাজলজ্জা তেমন নেই, আঁচল পড়ে গেছে কোমরের নীচে অথচ টানল না।

খানিকটা দূরত্ব রেখে শুয়ে পৃথা বলল, 'আপনি এখন এখানে থাকবেন তো!'

'যাওয়ার জায়গা আছে যে যাব!'

'কেন? আলিপুরদুয়ারে?'

'সে সব কবে চুকে গেছে!'

'মানে?'

'তিন দিনের ম্যালেরিয়ায় লোকটা গেল মরে। মাস্টারি করে তো বেশি টাকাপয়সা জমাতে পারেনি। এক ভাশুর নিয়ে যেতে চাইল তার কাছে। বউ খুব অসুস্থ, আমাকে দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু সবে বিধবা হওয়া ভাইয়ের বউয়ের দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল তাতে বুঝে গেলাম আমার

কপালে কী আছে। চিঠি লিখলাম তোমার শ্বশুরকে। তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। তোমার বর গো, ছুটিতে বাড়ি এসেছিল।' শ্বাস ফেলল পূর্ণিমা, 'বরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

বাসর শুরু হয়েছিল মধ্যরাতে। শিবানীদিদা জামাইয়ের সঙ্গে মজার মজার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জামাই বলেছিল, 'আমি কি এবার ঘুমাতে পারি?'

শিবানীদিদা চোখ কপালে তুলেছিল, 'ওমা! ঘুমাবে কী! বউয়ের সঙ্গে কথা বলো।'

'তার জন্যে তো বাকি জীবন পড়ে আছে।'

বাসর ভেঙে গেল। নীতা ছাড়া কুচোরা এসে শুয়েছিল তার পাশে। ওটাই নাকি নিয়ম। আলাপ কখন হবে?

'বুঝেছি!' পূর্ণিমা হাসল, 'তোমার বরটি একটা নারকোল।'

'মানে?'

'বাইরেটা শক্ত, শুকনো। ভাঙলে দেখবে মিষ্টি-নোনতা জলের আধার।'

একটু পরে পূর্ণিমার নাক থেকে বের হওয়া বাতাস শব্দ করতে লাগল। ঘুম আসছিল না পৃথার। এলোমেলো অনেক ভাবনার শেষে হঠাৎ মনে প্রশ্নটা হল, পূর্ণিমা কী করে জানতে পারল লোকটার ভেতরটায় মিষ্টি-নোনতা স্বাদ আছে! কীরকম অস্বস্তি শুরু হল তার।

এখানে বউভাতের খাওয়া-দাওয়া হয় দুপুরবেলায়। শেষ আমন্ত্রিত না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত পৃথাকে বলা হল প্রত্যেকের পাতে অন্তত এক হাতা ভাত পরিবেশন করতে। একটা সময় আর সে পারছিল না। শারীরিক যন্ত্রণা তীব্র হলে মনের কষ্ট উধাও হয়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না সে। পূর্ণিমা পাশে এসে বলল, 'বিকেল হয়ে এল আর কেউ খেতে আসবে বলে মনে হয় না। চলো, খেতে বসি।'

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। গা গোলাচ্ছে।'

'না হওয়ারই কথা। সেই দুপুর থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে রাজ্যের মানুষকে ভাত

দিয়ে গেলে খিদে থাকবে কী করে। কিন্তু ভাই, আজ তোমার ফুলশয্যা। না খেলে শরীরে বল পাবে কী করে? বর যদি দ্যাখে বউ দুমড়ে মুচড়ে বিছানায় পড়ে আছে তা হলে সে কি খুশি হবে?'

অতএব ভেতরের ঘরে গিয়ে খেতে বসতে হয়েছিল। কিন্তু একগ্রাস মুখে দিতেই শরীর গুলিয়ে উঠল। শাশুড়ি সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। অনেক আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পৃথার দিকে তাকিয়ে তিনি সুর করে কিছু বললেন। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল পূর্ণিমা। শাশুড়ি ধমক দিতে হাসি গিলে ফেলল সে। তারপর ফিসফিস করে পৃথাকে বলল, 'তোমার শাশুড়ি কী বলল বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল পৃথা, না।

'বলল এমন ভাব করছ যেন চার মাসের পোয়াতি। পেটে বাচ্চা এলে নাকি শরীর গোলায়। আমার তো আসেনি তাই কোনও অভিজ্ঞতাও নেই।' পূর্ণিমা বলল।

মুখ হাত কোনওমতে ধুয়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই কান্না ছিটকে এল গলায়। এসব কী কথা? আজ অবধি কাউকে বলতে শোনেনি সে! তার জীবনে কোনও পুরুষমানুষ আসেনি, বিয়ে হয়েছে দু'দিন হল অথচ শাশুড়ি উদাহরণ দিতে গিয়ে ওইরকম অশ্লীল কথা বললেন। সে তো ওঁর মেয়ের মতন!

নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল পৃথা। ক্রমশ তার মনে হচ্ছিল গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। যে আলোয় সে এতটা কাল আলোকিত ছিল তা দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল তার। মনে পড়া মাত্র লাইনগুলো স্পষ্ট হল, 'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে/ ওহে অন্ধকারের স্বামী।/ এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে/ আমার চিত্তে এসো নামি।'

গীতবিতানের এই লাইনগুলোর অর্থ প্রথম পাঠে বুঝতে পারেনি সে। এই অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে, অর্থ কী? বাবা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বোঝার পর সমস্ত শরীরে কদম ফুটেছিল। আজ এখন শরীরে যখন তীব্র যন্ত্রণা, মন যখন দুমড়ে মুচড়ে অসাড় তখন মনে হল ওই লাইনগুলো রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে লিখে গিয়েছিলেন। অন্ধকারের

স্বামীর অতল অন্ধকারে তার যাবতীয় অন্ধকার ডুবে যাক। তিনি অবশ্যই এই অন্ধকারের মাঝে এসে তার দুই হাত ধরবেন। ভাবতেই কীরকম একটা বিশ্বাস ধীরে ধীরে তাকে আলোয় নিয়ে এল।

'এই যে ওঠো।' পূর্ণিমার গলা কানে এল।

পৃথা উঠল না। পূর্ণিমা বলল, 'ওরা তোমাকে সাজাতে এসেছে। ফুলশয্যা বলে কথা! বর দেখে মুগ্ধ হবে! আমার তো হাত লাগাতে নেই তাই দূর থেকে কথা বলব।'

'কেন?' মুখ তুলল পৃথা।

'বাঃ। আমি বিধবা না! ফুলশয্যার ফুল অপবিত্র হবে যে।'

এই সময় শাশুড়িকে ঘরে ঢুকতে দেখে দ্রুত উঠে বসল পৃথা। শাশুড়ি পান চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু।

পৃথা উচ্চারণ বুঝতে না পেরে পূর্ণিমার দিকে তাকাল। পূর্ণিমা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

শাশুড়ি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখান কী?'

শাশুড়ি আরও এক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন আছ রে বা?'

পূর্ণিমা বলল, 'তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করছেন।'

'ভাল।' মাথা নেড়ে বলল পৃথা।

পূর্ণিমা বলল, 'না খেলে গায়ে জোর আসবে কী করে? অসুস্থ হয়ে থাকলে তোমার স্বামীর তো একটুও ভাল লাগবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন শাশুড়ি, কিছু বললেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন।

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করল, 'বুঝতে পারলে?'

মাথা নেড়ে না বলল পৃথা।

'বউ যদি স্বামীর মন না পায় তা হলে তার জীবনে রইল কী! অতএব খেয়েদেয়ে শক্তি বাড়িয়ে স্বামীকে খুশি করো।' মুখ ভেটকে উঠে গেল পূর্ণিমা।

রাত বাড়ছিল কিন্তু ঘুম আসছিল না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে খেতে হয়েছিল

পৃথাকে। পূর্ণিমা বলেছিল, 'একটু চালাক হও, দ্বিতীয় রাতেই এদের অবাধ্য হয়ো না।'

প্রণবকুমার ঘরে এল রাত সাড়ে দশটায়। এসে বলল, 'ঘুম পেলে স্বচ্ছন্দে ঘুমাতে পারো। আজ রাত জেগে কথা বলতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই।'

মনে মনে খুব খুশি হল পৃথা। প্রণবকুমার তার মায়ের ভাষায় কথা বলছে না।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে তাকে একই ভাবে বসে থাকতে দেখে প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল। 'কী হল? এখনও বসে আছ?'

'আপনি শোবেন না?'

'নিশ্চয়ই শোব। সারারাত কোন দুঃখে জেগে বসে থাকব।' বড় বিছানার এক পাশে শরীর ছড়িয়ে দিল প্রণবকুমার।

তাই দেখে বালিশে মাথা রাখল পৃথা। তার মনে হ ওই ওরা তাকে অতক্ষণ ধরে সাজাল যার জন্যে সে কি একবারও চেয়ে দেখেছে?

প্রণবকুমার আবার বিছানা ছেড়ে উঠে সুইচ টিপে আলো নেভাল। আচমকা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে।

ফিরে এসে বলল, 'বাড়ির জন্যে নিশ্চয়ই মন কেমন করছে?'

পৃথা বুঝতে পারল না, সত্যি কথা বলা ঠিক হবে কিনা।

'ক'দিন লাগবে। সব কিছু অভ্যেস হয়ে যাবে একসময়। তুমি নাকি গান গাও? কী গান? ভক্তিমূলক?

'না। রবীন্দ্রনাথের গান।'

'ও! ও সব গান আমার ন্যাকা ন্যাকা লাগে। ছিচকাঁদুনে গান।'

শোনামাত্র পৃথার বুকে একটি জলপ্রপাতের জন্ম নিল। তীব্র গতিতে সেই জলরাশি ছুটে আসছিল চোখে। সে প্রাণপণে তাকে আটকাবার চেষ্টা করছিল।

ফুলশয্যার পরের দিনেই রান্নাঘরে ঢুকতে হল পৃথাকে। তার আগে যে ঘটনা ঘটল তা কোনওদিন ভুলতে পারেনি পৃথা।

প্রণবকুমারের ঘুম ভাঙার আগেই বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে

গিয়েছিল সে। তাকে মায়াবতী বলে দিয়েছিলেন, 'রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাসি জামাকাপড় নিজের হাতে ধুয়ে দিবি।' গতকালও সেই কাজটা করেছিল সে। ধুয়েছিল কিন্তু মেলতে দেয়নি কাজের মেয়েটি। বালতিতে শাড়ি-জামা-সায়া রেখে নতুন শাড়ি জামা পরে নিতেই দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলল সে। দেখল প্রণবকুমার বিছানায় তো বটে, ঘরেও নেই। পূর্ণিমা বাথরুমের দরজায় শব্দ করেছিল। তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম ভাঙল?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পৃথা।

'ওমা! মুখ দেখে মনে হচ্ছে সারারাত জেগেই কাটিয়েছ। ব্যাপার কী?'

শাশুড়ি ততক্ষণে বিছানার ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন। পৃথার মনে হল তিনি তন্নতন্ন করে কিছুর সন্ধান করছেন। না পেয়ে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়লেন হতাশ ভঙ্গিতে। সেটা দেখে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে গেল পূর্ণিমা। পৃথা বুঝতে পারছিল না এরা ঠিক কী চাইছে? ঘরে ঢোকার পর শাশুড়ি একটা কথাও বলেননি। সে বুঝুক বা না বুঝুক উনি ওঁর মতো কথা বলে যাবেন বলে মনে হয়েছে পৃথার। এখন চুপচাপ কেন?

পূর্ণিমা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে যা বলল তা অনুমান করল পৃথা। পূর্ণিমা সম্ভবত বলল, 'কাপড়েও দাগ নেই।'

পূর্ণিমা হাসল, 'কী গো, কাল রাত্রে বর কি নাক ডেকে ঘুমিয়েছে? তোমাকে স্পর্শ না করে দূরে সরে থেকেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেকী!' পূর্ণিমা বলামাত্রই শাশুড়ি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পূর্ণিমা হাসল। 'বাব্বা! কচি হরিণকে মুখের সামনে পেয়েও বাঘ সন্ন্যাসী হয়ে গেল! দিনকে দিন কত দেখব!' পূর্ণিমা চলে গেল ঘর থেকে।

বুঝতে সময় লাগল। অস্পষ্ট, আবছা আবছা ভাবে বোধগম্য হওয়ার পরে থরথর করে কেঁপে উঠল পৃথা। বিছানায় বসে ঠোঁট কামড়াল সে। তপতীর কথা মনে পড়ল। তারা একসঙ্গে পড়ত। ক্লাস নাইনেই ওর বিয়ে হয়েছিল। ওই তার প্রথম বান্ধবী যার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। যেহেতু ওর বাবা নেই তাই মামারা ভাল পাত্র পেয়েই বিয়ে দিয়েছিল।

কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল তপতী। সাত দিন পরে তার মামার বাড়িতে আসার খবর পেয়ে পৃথারা গিয়েছিল দেখা করতে। কোথায় কান্না? হাসি ছাড়া কথা বলছিল না তপতী। বর কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে খুব হেসেছিল তপতী। হাসি সামলে সে বলেছিল, 'খুব দুষ্টু। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীগিরি ফলিয়েছিল। আমার খুব লেগেছিল আর রক্ত বেরিয়েছিল দেখে সেই রাতে থেমে গিয়েছিল। পরের রাতে আর থামেনি।' তপতী আবার হেসেছিল।

আবছা আবছা মনে হল, শাশুড়ি এবং পূর্ণিমা এসেছিল তার শরীর থেকে রক্ত বেরিয়েছে কিনা! তাই বিছানার চাদর দেখেছেন, তাই পূর্ণিমা বাথরুমে ঢুকেছিল জামাকাপড় পরীক্ষা করতে। পৃথার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে মরে গেলে সে বেঁচে যেত।

সকাল ন'টায় তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল জলখাবার খাওয়ার জন্যে। বাচ্চাকাচ্চারা লাইন দিয়ে বসে আছে মেঝের ওপর। সামনে কলাপাতা। তাতে ফেনাভাত আর কুমড়োসেদ্ধ দেওয়া হয়েছে। একটা পাতার সামনে পৃথাকে বসতে বলা হল।

যারা পরিবেশন করছিল তাদের একজন এগিয়ে এল, 'খেয়ে নিন বউদি। প্রণবদা আমার জেঠতুতো দাদা। আমি প্রবাল।'

ছেলেটির দিকে তাকাল পৃথা। বছর কুড়ি-একুশের তরুণ। এই বাড়ির অধিকাংশ সদস্যকে সে এখনও চেনে না। প্রবাল বলল, 'বসে পড়ুন।'

অগত্যা বসতে হল। প্রবালের হাতে বালতি, তাতে ফেনাভাত। সে ওপাশের একজনকে আর এক হাতা ভাত দিতে গেল। হাত বাড়াল পৃথা। ঠান্ডা জমে যাওয়া ভাত। চটচটে। আজ অবধি সে এরকম ভাত সকালে কেন দুপুরেও খায়নি। মাঝে মাঝে বাবার শখ হলে ফেনাভাত, আলুভাজা, ডিমের ওমলেট খাওয়া হত। সেটা দুপুরে, বিশেষ করে শীতকালে। সেই ভাত থাকত বেশ গরম। মা তার ওপর একটু ঘি ছড়িয়ে দিত। একটু ভাত তুলে মুখে দিল পৃথা। বিস্বাদ লাগল। একেবারে নুন নেই। দ্বিতীয়বার গলা দিয়ে নামতে চাইল না। কুমড়ো তার অত্যন্ত অপছন্দের, কুমড়োসেদ্ধ সে কখনও খায় না। তার খেতে ভাল লাগে না। তৃতীয়বার ভাত মুখে দেওয়ার

পরও অনেকটা রয়ে গেল পাতায়। এখন উঠে যেতে পারলে সে বেঁচে যায়। এই সময় প্রবাল ফিরে এল। তার পাতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আপনি উঠুন বউদি। বুঝতে পেরেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল পৃথা। বাঁ হাতে আঁচলটা টেনে ধরে ঘোমটা ঠিকঠাক করে সে দ্রুত ভেতরে চলে যেতে যেতে বুঝল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মিনিট কুড়ি পরে দরজায় শব্দ হতে পৃথা খাট থেকে উঠে সেটা খুলে অবাক হল। প্রবাল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা প্লেট।

প্রবাল বলল, 'নিন, এটা বোধহয় আপনার ভাল লাগবে।'

প্রবালের বাড়িয়ে ধরা প্লেটে একটা ডিমের ওমলেট, দুটো সন্দেশ রয়েছে। দ্বিধা সত্ত্বেও পৃথা সেটা নিতে প্রবাল জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরে জল আছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পৃথা।

'চলি।' প্রবাল চলে গেল।

খেয়ে তৃপ্তি পেল পৃথা।

স্নান সেরে বন্ধ ঘরে বসে ছিল সে। পূর্ণিমা এল, 'এই যে বউদি। তুমি তো একদিনেই বেশ ভক্ত পেয়ে গেছ। বাড়ির সবাই ফেনাভাত খেতে পারল তুমি পারলে না। তোমার অসুবিধে একজন ঠাকুরপো বুঝতে পেরেছে। যাক গে, চলো।'

'কোথায়?'

'তোমার শাশুড়ির ইচ্ছে তুমি এ বাড়ির রান্না শিখে নাও।'

'রান্না?'

'বাব্বা! ভূতের কথা শুনলে নাকি!' চোখ বড় করল পূর্ণিমা, 'যাক গে! প্রত্যেক বাড়ির কিছু নিজস্ব রান্না আছে। সেটা সেই বাড়ির লোকজন খেতে ভালবাসে। তা তুমি এখন এই বাড়ির বউ, তোমার তো সেগুলো এক-এক করে শিখে নিতে হবে।'

'আমি—আমি—!' কী বলবে ভেবে পেল না পৃথা।

'আরে! আমি তো আছি। চলো।'

অতএব যেতে হল। তাকে নিয়ে পূর্ণিমা রান্নাঘরে যাচ্ছে দেখে সবাই

মুচকি হাসল। রান্নাঘরে তখন কাঠের উনুন দাউদাউ করে জ্বলছে। উনুনের ওপরে একটা বড় সসপ্যানে কিছু সেদ্ধ হচ্ছে।

রান্নাঘরের এক পাশে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল পৃথা। শাশুড়ি এলেন।

পূর্ণিমা তাঁকে বলল, 'বউমা, বোধহয় আগে কখনও রান্নাঘরে ঢোকেনি।'

এরপরে শাশুড়ির কথা বলা এবং পূর্ণিমার তর্জমা করে দেওয়া চলল, 'মেয়ে মানুষের বেশি বিদ্যে থাকা ভাল নয়।'

এবং তারপরে, 'শোনো, তুমি হলে নতুন বউ, আমার বাড়ির কোনও নিয়ম জানো না, এই বাড়িতে দিনের বেলায় মেয়েমানুষ পুরুষদের সঙ্গে একঘরে থাকে না।'

একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এলেন। তাঁকে পূর্ণিমা বলল মাংসের ঝোল রান্না করে দেখাতে।

দ্বিতীয় রাত্রে প্রণবকুমার স্বামীত্বের অধিকার প্রয়োগ করল।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙামাত্র প্রণবকুমার আজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না। উলটো দিকে ফিরে হাঁটু কোমরের কাছে গুঁজে শুয়ে থাকা পৃথার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর ঠিক আছে তো?'

পৃথা জবাব দিল না। গোটা রাত জাগ র পর ভোরের দিকে ঝিমুনি এসেছিল। বড়জোর ঘণ্টাখানেক। তার বুক, তলপেট এবং যোনিদ্বারে এখনও ব্যথা পাক খাচ্ছে। প্রণবকুমার যখন সক্রিয় ছিল তখন সে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে ছিল। তপতী বলেছিল এর মতো আনন্দ নাকি পৃথিবীর কোনও কিছুতে পাওয়া যায় না। ওই যন্ত্রণা পাওয়ার অনুভূতি কী করে আনন্দজনক হতে পারে? বিয়ের পর সব পুরুষই তার স্ত্রীকে এইভাবে ভোগ করতে চায়। কাল রাতে যে প্রণবকুমার বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা পায়নি, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি পৃথার। ঘটনাটি ঘটানোর পর ওপাশে শুয়ে টানা ঘুমিয়ে গেছে লোকটা। বোধহয় আনন্দ পেয়েই ওইরকম ঘুম ঘুমাতে পেরেছিল।

তখন, রাতের তিন প্রহরে, শরীরে যখন তীব্র যন্ত্রণা, মনে বিচ্ছিরি অনুভূতি, তখন আচমকা কথাটা মাথায় এসেছিল। কীরকম দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল পৃথা।

রবীন্দ্রনাথ কি মৃণালিনীদেবীর সঙ্গে এই একই কাণ্ড করেছিলেন? প্রণবকুমার যেভাবে তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে সেই একই ভাবে তিনি মৃণালিনীদেবীকে কষ্ট দিয়েছেন? বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। না, কিছুতেই তিনি এমন কাজ করতে পারেন না।

'এখনও কি শরীর খারাপ লাগছে?' প্রণবকুমার আবার জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেড়ে নীরবে মিথ্যে বলল পৃথা, না।

'কথায় আছে, অনভ্যাসের চন্দন কপালে চড়চড় করে। অভ্যেস হয়ে গেলে আর অসুবিধে হবে না।' হাসল প্রণবকুমার, 'আমাদের বাড়ির মানুষদের কেমন লাগছে?'

কথা বলতে বাধ্য হল পৃথা, 'ভাল।'

'শুনলাম, প্রবাল তোমাকে স্পেশ্যাল খাতির করেছে?'

'কে বলল?'

'পূর্ণিমা বলছিল। শোনো, পূর্ণিমা খুব দুঃখী মেয়ে। এমন কিছু কোরো না বা বোলো না যা ওকে আঘাত দেবে। এ বাড়ির ভাষা বুঝতে পারছ?'

'উনি বুঝিয়ে দেন।'

'তবে? সে তোমার কত উপকার করছে বলো।' প্রণবকুমার বলল, 'আমার আজ আর একটু ঘুমাতে ইচ্ছে করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল পৃথা। তারপর সন্তর্পণে খাট থেকে নামতেই চিনচিনে ব্যথাটাকে টের পেল। প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আরে! কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে।'

'কেন? এত সকালে বাইরে গিয়ে কী করবে?'

'দিন হয়ে গিয়েছে যে।'

'তো?'

'উনি বলেছেন, এ বাড়িতে মেয়েমানুষ দিনের বেলায় পুরুষদের সঙ্গে এক ঘরে থাকে না।'

'মাই গড! কে বলেছে? মা?'

'হ্যাঁ।'

'মায়ের কথা তুমি বুঝলে কী করে? পূর্ণিমা বুঝিয়ে দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি যতক্ষণ না ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ তুমি শুয়ে থাকবে। শোও বলছি!' শেষ শব্দ দুটো বেশ জোরে বলল প্রণবকুমার।

বাধ্য হয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল পৃথা। জানলা দরজা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। তাতে ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে ঘরের ভেতরটা। হঠাৎ প্রণবকুমারের হাত এসে পড়ল তার কাঁধে, 'ওই দিকে মুখ ফিরিয়ে আছ কেন?'

হাতটার ওজন কম নয়। পৃথা সেটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেই প্রণবকুমার তার হাত ধরে নিজের দিকে টানতেই মুখোমুখি হয়ে গেল পৃথা। হাতে ব্যথা লাগতেই মুখ থেকে উঃ বেরিয়ে এল।

প্রণবকুমার সেটা উপেক্ষা করে বলল, 'রাতের অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পাইনি, দিনের আলোছায়ায়, নয়নভরে দেখি।' বলতে বলতে আঁচল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল বুক থেকে।

পৃথা তীব্র আপত্তি জানাল, 'না।'

'না কেন? আমি তোমার স্বামী, তোমাকে দেখব না?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তে লাগল পৃথা। তখনই জল উপচে এল দুই চোখ থেকে। প্রণবকুমারের চোখ সেই দৃশ্য দেখতে পাওয়ামাত্র হাত সরে গেল পৃথার শরীর থেকে। একটু অপরাধীর গলায় প্রণবকুমার বলল, 'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।'

চিত হয়ে শুয়ে রইল প্রণবকুমার মিনিট দুয়েক। তারপর 'চোখ মোছো' বলে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে গেল। কাপড় ঠিক করে আঁচলে চোখ মুছে নিল পৃথা। প্রণবকুমার বাথরুম থেকে বেরিয়ে 'আসছি' বলে দরজা খুলে চলে গেল।

পৃথার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। শ্বাস স্বাভাবিক হল। কিন্তু তার পরেই মনে হল, প্রণবকুমার বোধহয় মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। তার

ভাল লাগছে না বুঝতে পারামাত্র নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল লোকটা। এমনকী যাওয়ার সময় যে গলায় চোখ মোছো বলে গেল তাতে যথেষ্ট মমতা ছিল। তবু, লোকটা রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ করে না। খুব খারাপ কথা বলেছে। ঠিক আছে, সে কোনওদিন ওর সামনে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবে না। পৃথা বিছানা থেকে নামল।

বাথরুম থেকে বেরুতে না বেরুতেই পূর্ণিমা ঘরে ঢুকল। ঢুকে পৃথার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। পৃথা অস্বস্তিতে পড়ল। পূর্ণিমা তাকে টেনে নিয়ে আয়নার সামনে গেল, 'এটা কী?' পৃথার গালে গলায় আঙুল বোলাল সে।

পৃথা দেখতে পেল দু'জায়গায় কালসিটে কিন্তু বেশ আবছা।

পূর্ণিমা চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হয়ে গেল?'

মুখ নিচু করে সরে দাঁড়াল পৃথা।

'যাই, তোমার শাশুড়িকে খবরটা দিয়ে আসি।'

'না!' ঠোঁট ভেদ করে বেরিয়ে এল শব্দটা।

'অ্যাঁ? ঠিক আছে, আপত্তি করছ যখন তখন বলব না। কিন্তু আমি না বললে কী হবে, বাড়ির যত বুড়ি থেকে ছুঁড়ি আজ তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। তোমার শাশুড়ি তাই খেপে আগুন হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক বলে সামলালাম।'

খুব ভয় পেয়ে গেল পৃথা, 'কেন?'

'কেন! বাইরে চনমনিয়ে রোদ উঠে গেল অথচ তোমার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধই রয়ে গেল। কমলাপিসি তো বলেই দিল, সমতলের মেয়ে তার ওপর পেটে বিদ্যে ঢুকেছে, একটু নির্লজ্জ তো হবেই। দ্যাখো গিয়ে, খোকা নিশ্চয়ই বিছানায় থাকতে চাইছে না, সে জোর করে টেনে শোওয়াচ্ছে। আমি অবশ্য খুব প্রতিবাদ করেছি। তুমি ওরকম মেয়েই নও। তা আমার কথা ওরা কানে নেবে কেন? আমি তো বিধবা মেয়েমানুষ। এসব কথায় আমার থাকা উচিত নয়।'

'আমি কিছু করিনি।' নিস্তেজ গলায় বলল পৃথা।

'তা কি আমি জানি না!' হাসল পূর্ণিমা, 'তা শাড়ি সায়া ভিজিয়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কাচা হয়ে গিয়েছে।'

'দিলে বারোটা বাজিয়ে। তোমার শাশুড়ির মনে কিছুতেই শান্তি আসছে না। কারা যেন এসেছে বলে আটকে গিয়েছে তাই আমাকে পাঠাল দেখতে আর তুমি তা দেখার সুযোগই দিলে না।' পূর্ণিমা বলল।

'কী?' পৃথা বুঝতে পারল না।

'ওঃ। কাল রাত্রে তোমার বর যা করেছে তার কারণে তোমার শরীর থেকে রক্ত বের হয়েছে কি?'

শিউরে উঠল পৃথা। এই প্রশ্ন করার কথা তার বাড়ির কেউ মরে গেলেও ভাবতে পারত না। সে এখন মাথা নাড়ল, 'হুঁ।'

'বেশ। তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম। তাই বলব। এখন চলো, জলখাবার খাবে। এখন ভাত গরম আছে।'

পূর্ণিমার কথার মধ্যেই দরজায় শব্দ হল। পূর্ণিমা গলা নামিয়ে বলল, 'তোমার শাশুড়ি বোধহয়। আর ধৈর্য ধরতে পারল না।' সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই মেজাজ হারাল, 'তুই?'

'বউদির ব্রেকফাস্ট। আপ্যায়ন থেকে নিয়ে এলাম। গরম গরম ফিশফ্রাই।'

'বাব্বা! হঠাৎ বউদির জন্যে এত দরদ?'

'দরদ আবার কী? প্রণবদা টাকা দিয়ে কিনে আনতে বললে আমি কি পারব না বলব? এই নিন বউদি।' দোকান থেকে দেওয়া খাবারের বাক্স পৃথার দিকে এগিয়ে ধরল প্রবাল।

'নাও, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। প্রথম প্রেমের উপহার। এ বাড়ির কেউ আজ অবধি মুখ ধুয়ে ফিশফ্রাই খাওয়ার কপাল করে আসেনি, তুমি এসেছ।' প্যাকেট নিয়ে পৃথার হাতে গুঁজে দিল পূর্ণিমা।

প্রবাল আর একটু এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'ওর মধ্যে দুটো ফ্রাই আছে।'

'দু-দুটো? খেতে পারবে?' নাক কোঁচকাল পূর্ণিমা।

'বউদির একার জন্যে নাকি? প্রণবদা বলল, 'যাচ্ছিস যখন তখন দুটো নিয়ে আয়। পূর্ণিমার মন যদি চায় তা হলে আমার ঘরে বসে খেয়ে নিতে পারে। তাই তো দুটো এনেছি। প্রণবদা আমাকেও খেতে বলেছিল, আমি

ফিশফ্রাই না খেয়ে বিকেলে ফিশ কবিরাজি খাব।' ঘুরে দাঁড়াল প্রবাল, 'ভয় নেই, আমি তো দেখছি না, তুমি খাচ্ছ কিনা, তাই কাউকে বলব না।' প্রবাল চলে গেল।

পূর্ণিমা গালে হাত দিল, 'কী ভয়ংকর ছেলে রে বাবা!'

'কী হবে এখন?' পৃথা জিজ্ঞাসা করল।

'ওগুলো তুমিই খেয়ে নাও।'

'আমি এত খাবার কখনও খাইনি। তোমার জন্যেও তো এনেছে।'

'খেয়ে মরি আর কী! হিন্দুঘরের বিধবা, মাছ মাংস ডিম ছুঁই না। খুব কষ্ট হয় বলে তোমার শ্বশুর পেঁয়াজ খেতে বলেছেন। সেই আমি যদি ফিশফ্রাই খাই তা হলে রক্ষে থাকবে? চারদিকে ছি ছি শুরু হয়ে যাবে।'

বিধবাদের আমিষ খেতে নেই তা পৃথা শুনেছে। কিন্তু শিবানীদিদিমা বিধবা হওয়া সত্ত্বেও মাছ খান। বাবা বলেছে, 'প্রোটিন না খেলে কী করে চলবে?' শিবানীদিদিমার ছেলে নাকি বলেছিল, 'তা হলে আমিও মাছ মাংস ছেড়ে দেব।'

পৃথা বলল, 'প্রবাল তো বলল কাউকে বলবে না।'

'বিশ্বাস কী? স্বার্থে ঘা পড়লেই মুখ খুলবে।'

'উনি যখন বলেছেন তখন ও নিশ্চয়ই শুনবে।'

'না বাবা। অনেক দিন খাইনি, আজ খেলে যদি বমি হয়ে যায়। মাছের গন্ধটাও তো মনে নেই।' মাথা নাড়ল পূর্ণিমা।

'একটু খেয়ে দ্যাখো। ভাল না লাগলে খাবে না।'

হেসে ফেলল পূর্ণিমা, 'হিন্দু বিধবার গল্প জানো! এক হিন্দু বিধবা তার বোনের বাচ্চাকে খুব আদর করছিল। এক বছরের বাচ্চা। খুব দুষ্টু। বাচ্চাটা আদর পেয়ে মাসিকে হাম খেতে চাইল। মাসি তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। বোন ব্যাপারটা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিল, 'আমি বিধবা মানুষ হয়ে চুমু খাই কী করে?' হেসে গড়িয়ে গেল পূর্ণিমা। হাসল পৃথাও। এই প্রথম তার পূর্ণিমাকে সহজ বলে মনে হচ্ছিল। সে আবার অনুরোধ করতে পূর্ণিমা একটু ভেবে বলল, 'এত করে যখন বলছ, বেশি খেতে পারব না কিন্তু। দাঁড়াও দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিই।'

মাঝারি সাইজের ফিশফ্রাই কিন্তু খেতে বেশ ভাল। কিন্তু কিন্তু মুখ করে দাঁতে কাটল পূর্ণিমা। চোখ বন্ধ করে চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'না, গন্ধ লাগছে না। উঃ, কত্তকাল পরে খাচ্ছি।'

পৃথার খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই পূর্ণিমার শেষ হয়ে গেল। সে চলে গেল বাথরুমে। গিয়ে বলল, 'পেস্টটা নিচ্ছি।' আঙুলে পেস্ট মাখিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বলল, 'আঃ।'

আর তখনই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলের সঙ্গে কোনও কুমারীর বিয়ে দেননি। প্রতিমাদেবী বিধবা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেন।

সে পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা জানতে চাইব?'

'বলো!'

'তুমি এত সুন্দরী, এমন কিছু বয়স নয়, আবার বিয়ে করলে না কেন?'

'কী হবে বিয়ে করে?'

'কেন?'

'আমার সিংহ রাশি, রাক্ষস গণ। বিয়ে করলেই স্বামীকে খেয়ে ফেলব।' জোরে হেসে উঠল পূর্ণিমা।

'না না। সত্যি কথা বলো।'

'যাকে মনের মানুষ বলে ভাবলাম তার ক্ষমতা নেই আমাকে বিয়ে করার। বাকি সব তো আমার কাছে বনের মানুষ। মনে ধরবে কেন?' এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি নামিয়ে দিল পূর্ণিমা।

'তাঁর ক্ষমতা নেই কেন?'

'নিয়ম ভাঙতে গেলে বুকে সাহসের দরকার হয় ভাই।'

'আমি বুঝতে পারলাম না।'

'সব বোঝার চেষ্টা করতে নেই। তাতে ভাল থাকা যায়। বুঝলে বেশির ভাগ সময় দুঃখ বাড়ে। চা খাবে?'

'না।'

'আজ আমার খুব ইচ্ছে করছে চা খেতে।'

'আপনার চা খাওয়াও বারণ?'

'আগেকার দিনে ছিল। চা, পান সব বারণ। কোনও নেশা করা চলবে না। যাই, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। তুমি আসবে নাকি?'

রাজি হল পৃথা। ইতিমধ্যে জলখাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে বাচ্চারা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অপলক তাকিয়ে আছে ওরা। যেন বিস্ময় কিছুতেই কাটছে না। এই সময় শাশুড়ি এগিয়ে এলেন সামনে। 'তুমি কেমন আছ?'

মানে বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল পৃথা, 'ভাল।'

শাশুড়ি কিছু বললেন।

উচ্চারণে বাক্যটি দুর্বোধ্য হয়ে গেল। দূর থেকে প্রবালের গলা ভেসে এল, 'কিছু বুঝতে পারলে বউদি? দাদার জন্যে রোজ এক একটা রান্না শিখে নিতে বলছেন।'

শাশুড়ি বেশ জোরে ধমক দিলেন প্রবালকে। তারপর যা বললেন তা পূর্ণিমা এসে বুঝিয়ে দিল। তোমার শাশুড়ি চাইছেন খুব তাড়াতাড়ি শুধু বোঝা নয়, বাড়ির ভাষা যেন বলতে পারো। নইলে এ বাড়ির বউ হবে কী করে? তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'প্রবালকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বসতে দিলে শুতে চাইবে। ও তোমার চেয়ে বেশি বড় নয় যে!'

ভোরবেলায় সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় প্রণবকুমার, ফিরে আসে রাতের খাওয়া সেরে। এই ঘরে ওর জিনিসপত্র নেই। জামাকাপড়ও রাখেনি, তার মানে, প্রণবকুমারের আর একটা ঘর আছে। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি পৃথা। সকাল সন্ধ্যা তাকে মাথায় আঁচল তুলে পুতুলের মতো ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পূর্ণিমা তাকে বলেছে, বয়স্করা দাঁড়িয়ে থাকলে সে যেন চেয়ারে বা মোড়ায় না বসে থাকে। শুধু দুপুরবেলায়, খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে আসতে পারে সে। একা থাকাটা বেশ স্বস্তির। এখন যদি প্রণবকুমার ঘরে থাকত তা হলে মেরুদণ্ড সোজা করে রাখতে হত। এখন হাতে বই না পাওয়ায় খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিয়ের আগের দিন থেকে সেই যে বই পড়া বন্ধ হয়ে গেছে সেটা যদি সারা জীবন ধরে হয়? আঁতকে ওঠে পৃথা। তা হলে সে ফিরে যাবে বাবার কাছে।

রাত্রে প্রণবকুমার বিছানায় এসেই সক্রিয় হল। কয়েক মিনিট পরে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি খারাপ লাগল?'

কী জবাব দেবে পৃথা। সে চুপ করে থাকল।

একটু পরে প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

উত্তর দিল না পৃথা। অসুবিধে তো অনেক হচ্ছে, সে সব বললে যদি খারাপ ভাবে!

'তোমার কিছু দরকার হলে বলতে পারো!' প্রণবকুমারের গলায় আন্তরিকতা স্পষ্ট।

'বই পেলে ভাল হত।' মিহি গলায় বলল পৃথা।

'বই? কী বই?

'গল্পের বই।'

'অ। ঠিক আছে।'

সকালে পূর্ণিমা ঘরে ঢুকে বলল, 'এর পৌষমাস, ওর সর্বনাশ।'

'মানে?'

'মানে আর কী! তুমি অত খুকি নও যে বুঝতে পারবে না।'

'সত্যি আমি বুঝতে পারছি না।'

'বিয়ে করে তোমার বরের এখন পৌষমাস চলছে। বিয়ে দিয়ে তোমার শাশুড়ির সর্বনাশ হয়েছে। যে ভাষায় তোমাকে গালাগাল করছে তা শুনলে পেটখারাপ হয়ে যেত। অবশ্য একটা ভাল দিক, শুনলেও বুঝতে না কিছু।'

'আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

'নেকু। কিছুই যেন জানো না।'

'সত্যি বলছি, জানি না।'

'শরীরের আনন্দ পাওয়ার পর ছেলেরা খুব উদার হয়। তখন বউ যা চায় তাতেই হ্যাঁ বলে। তুমি নিশ্চয়ই সেই সময় ওকে বলেছ তোমাকে পুনেতে নিয়ে যেতে। আর সে দেখল, এত দিন একরকম ছিল, এখন

বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, এখন কী করে পুনেতে একা একা থাকবে! তাই আজ সকালে বাবার কাছে গিয়ে ছেলে বলেছে তোমাকে পুনেয় নিয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হয়। এটা শুনে তোমার শাশুড়ি খেপে আগুন। কাল ছেলে তার বউকে ফিশফ্রাই খাইয়েছিল জেনে এমনিতেই মুখ গোমড়া করে ছিল। এখন বলছে, এ বাড়ির আদবকায়দা, ভাষা না শেখা পর্যন্ত তোমাকে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না।' হাই তুলল পূর্ণিমা, 'আমার হয়েছে বিপদ। গতবার তোমার শাশুড়ি ছেলের খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে শুনে আমাকে পাঠাতে চেয়েছিল। শেষমুহূর্তে তোমার শ্বশুর বেঁকে বসায় যাওয়া হয়নি। এবার আবার সেই তাল না তোলে!'

অবাক হয়ে গেল পৃথা। তার পরেই মনে হল পূর্ণিমা প্রণবকুমারের সম্পর্কিত ভাই। ভাইয়ের বাড়িতে বোন তো যেতেই পারে।

এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। পূর্ণিমা উঠল, 'এসে গেছে।'

দরজা খুলতেই প্রবাল ঘরে ঢুকল। ওর এক হাতে খাবারের প্যাকেট, অন্য হাতে বই। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করল, 'মোগলাই পরোটা পাওয়া গেল?'

'সকালে মোগলাই পরোটা হয় না। চিকেন কাটলেট এনেছি।'

'অ। টাকা ফেরত এসেছে?'

'পাঁচ টাকা। আমার সার্ভিসচার্জ দেবে না?'

'আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করছে না?'

'ও ব্বাবা। বউদি, নাও, দাদা পাঠিয়ে দিয়েছে।' পৃথার দিকে একটা বাংলা বই এগিয়ে দিতেই পৃথা খপ করে ধরল। ধরতেই মনে হল কত দিন পরে সে বইয়ের স্পর্শ পেল।

'কী বই ওটা? নভেল নাকি?'

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদাহ।' প্রবাল বলল।

পূর্ণিমা বলল, 'শুনেছি তোমার নাকি নভেল পড়ার খুব শখ।'

'তুমি পড়ো না?' পৃথা বইটাকে বুকে চেপে ধরেছিল।

'নাঃ, বিধবা মেয়েমানুষের নভেল পড়া উচিত নয়।'

'ওমা! কেন?'

'নভেল পড়লে চরিত্র খারাপ হতে পারে। আমার চরিত্র খারাপ হলে মাথার ওপর ভদ্রবাড়ির ছাদ জুটবে না গো। বাজারে নাম লেখাতে হবে।' হেসে প্রবালের হাত থেকে খাবারের প্যাকেট নিয়ে বলল পূর্ণিমা, 'তোর কোনও কাজ নেই?'

'কেন?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষদের কথা শুনছিস!'

'এইজন্যেই বলে, কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।' দরজা খুলে প্রবাল বলল, 'কাল থেকে তুমি বললে কিছুতেই খাবার আনব না।'

দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে পূর্ণিমা বলল, 'সাধ হল মোগলাই পরোটা খাব! কত বছর খাইনি ও জিনিস, আনল চিকেন কাটলেট। এ বাড়িতে চিকেন ঢোকা নিষেধ। জানো?'

মাথা নেড়ে না বলল পৃথা।

'খাও। দেখেছ সঙ্গে পেঁয়াজ আনেনি। ভীষণ বদ ওই ছেলেটা।' চিকেন কাটলেটে কামড় দিল পূর্ণিমা। দিতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সকালবেলায় এসব খাওয়ার অভ্যেস ছিল না পৃথার। খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়ে বলল, 'আমি পুরোটা খেতে পারব না।'

'কেন?' চিবিয়ে খাচ্ছিল পূর্ণিমা।

'কীরকম গা গুলিয়ে উঠল।'

'বাব্বা। ফুলশয্যার তিনদিন পরে কারও গা গোলায় জীবনে শুনিনি।' দেড়খানা কাটলেট খেয়ে দাঁত মেজে মুরগির অবশিষ্ট অংশগুলো কাগজে মুড়ে পূর্ণিমা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র উপুড় হয়ে শুয়ে বই খুলল পৃথা। আঃ।

অক্ষরগুলো এমন আঁকড়ে ধরল পৃথাকে যে সে জগৎসংসার ভুলে গেল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অচলা কাকে ভালবাসে? সুরেশ না মহিমকে? এই দুটো পুরুষ দু'রকমের। যেন অনেক কাল অভুক্ত থেকে মরুভূমিতে হাঁটার পর আচমকা জল দেখলে অভিযাত্রীদের যে অবস্থা হয় পৃথার তাই হল। দরজায় যে শব্দ হচ্ছে তা তার কানেই ঢোকেনি। শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চা মেয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে এসে চেঁচিয়ে যা ঘোষণা করল তার সবটা বুঝতে না পারলেও পৃথা অনুমান করল তাকে কেউ ডাকছে। সে বিছানা থেকে নেমে শাড়ি ঠিক করে চুল আঁচড়ে নিতেই

মেয়েটি তার আঙুল ধরল। যেন তাকে স্পর্শ করে সে খুব গর্বিত হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। পৃথা দেখল মেয়েটি তাকে রান্নাঘরের দিকে না নিয়ে গিয়ে উঠোন পেরিয়ে যে ঘরটিতে নিয়ে গেল সেখানে একটা ইজিচেয়ারে শ্বশুরমশাই বসে আছেন। তাঁর খানিকটা তফাতে প্রণবকুমার এবং শাশুড়ি দুটো চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। এপাশে আর একজন বৃদ্ধ মানুষ লাঠি হাতে রয়েছেন। শ্বশুরমশাই বললেন, 'এসো বউমা, বসো।'

পৃথা বসল না। ঘোমটা সামনের দিকে সামান্য টেনে দিল।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'তোমাকে ডেকেছি দুটো কারণে। তোমার শাশুড়ি বলছেন তুমি নাকি সকালে জলখাবার খাও না। দু'বেলা ভাতও নাকি খেতে হয় তাই খাও। কী ব্যাপার? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

মাথা নেড়ে না বলল পৃথা।

'তা হলে? না খেলে শরীর থাকবে কী করে?'

ঘোমটার আড়াল রেখে স্বামীকে আড়চোখে দেখে নিয়ে পৃথা বলল, 'আমি তো খাই।'

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি দ্রুত যা বললেন তা বোধগম্য হল না পৃথার।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' হাত তুলে স্ত্রীকে থামালেন শ্বশুরমশাই, 'দুনম্বর কথা হল, তুমি এই বাড়ির বউ হয়ে এসেও দূরে দূরে থাকছ। ভাষা শেখার চেষ্টা করছ না, রান্নাও নয়। বাড়ির বড় বউয়ের ওপর সমস্ত সংসার একদিন নির্ভর করবে। তার জন্যে নিজেকে তৈরি করো। আমি জানি এসব একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে।'

শ্বশুরমশাই ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল যে তিন দিনের জন্যে তুমি দ্বিরাগমনে বাপের বাড়িতে যাবে। কিন্তু প্রণব চাইছে না যেতে। কারণ তাকে অফিস থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। কোনও একটা জরুরি দরকারে তাকে যে ছুটি দেওয়া হয়েছিল তা কমিয়ে তাড়াতাড়ি জয়েন করতে বলেছে। দ্বিরাগমনে গেলে তোমাকে নিয়ে আবার এ বাড়িতে ফিরে আসার সময় তার নেই। তাই তোমার শাশুড়ি চাইছেন, প্রণব সামনের বছরের ছুটিতে এলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিরাগমনে যাবে। অর্থাৎ একটা বছর পিছিয়ে গেল ব্যাপারটা।

সময় যেভাবে দ্রুত চলে যায়, এক বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে। এখন তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।'

পৃথার দুটো পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটু ঠেলা লাগলেই সে পড়ে যাবে। একটা বছর সে বাপের বাড়িতে যেতে পারবে না? এই বাড়িতে তাকে একা থাকতে হবে?

'কিছু বলার নেই তো?' শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রণবকুমার কথা বলল, 'বাবা, একটা কাজ করলে কেমন হয়! আমি পুনে যাওয়ার পথে ওকে বাপের বাড়িতে রেখে গেলাম। সামনের বছর ছুটিতে আসার পথে আবার নিয়ে এলাম ওকে!'

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি বলে উঠলেন কিছু। সেটা শুনে শ্বশুর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। এক বছর বউমা বাপের বাড়িতে পড়ে থাকলে আত্মীয়স্বজনরা পাঁচকথা বলবে। দেখতেও ভাল লাগে না। তা ছাড়া এর ফলে এ বাড়ির সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে।'

প্রণবকুমার বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ও পুনে যাবে। এত দিন কষ্ট করে খাওয়া-দাওয়া করছি, বিয়ের পর যদি একটু সুরাহা না হয়—।'

'নিয়ে যেতে হয় তো বৌমার বাচ্চা হলে নিয়ে যেয়ো।'

'তা হলে আমি রেখে চলে যাই, আপনারা কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে আসবেন। ওর বাবাও পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে।' উঠে দাঁড়াল প্রণবকুমার।

শাশুড়ি ছেলের দিকে তাকিয়ে যে কথাগুলো বললেন তাতে পূর্ণিমা শব্দটা ছিল। প্রণবকুমার বলল, 'সে যদি যেতে চায় আর তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমার কোনও অসুবিধে নেই। দু'বেলা বাঙালি রান্না পেলেই আমি খুশি।'

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পূর্ণিমা এল, 'এসব কী কথা বলো তো। আমি বিধবা মানুষ, আমাকে নিয়ে এই টানাটানি কেন?'

বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল পৃথা। পাশে বসে পূর্ণিমা বলল, 'আমি চলে গেলে তোমার তো খুব অসুবিধে হবে। তবে কিনা, সেই যে কথা আছে না, শুনতে শুনতে শিখে যাবে ঠিক। এক বছর পরে যখন আসব

তখন দেখব চমৎকার এই বাড়ির ভাষা বলছ।'

পৃথা উঠে বসল। বলল, 'তোমরা তো আপন ভাইবোন নও।'

'সেই তো কথা। আমাকে বিধবার যা যা করণীয় সব করতে হবে। এই ধরো নিরামিষ খাওয়া, এখানে কালো পাড়ের সাদা কাপড় পরি, ওখানে থান পরে থাকতে হবে। দু'বেলা ঠাকুর পুজো করতে হবে। তোমার বরের জন্যে নাকে গামছা বেঁধে মাছমাংস রাঁধতে হবে। নিজে তো ওসব মুখে তুলতে পারব না। কোনও চিন্তা কোরো না তুমি, তোমার বরের কোনও অসুবিধা আমি হতে দেব না।'

বিছানার পাশে পড়ে থাকা বইটাকে তুলে ধরল পূর্ণিমা। গৃহদাহ নামটা দেখামাত্র হাসি ফুটল তার মুখে।

'কার গৃহ পুড়ল গো?'

'মানে?'

'এই যে পড়ছ! গৃহদাহ!'

'আমার এখনও পড়া শেষ হয়নি।'

পূর্ণিমা উঠে পড়ল, 'আমার গৃহ তো কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই যে বলে ঘরপোড়া গোরু, আমি তাই। সেইজন্যে তুমি নিশ্চিন্তে থেকো, কারও গৃহ আমি দাহ করব না।' পূর্ণিমা চলে গেল।

কিন্তু প্রাণকুমারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাড়ির যত বয়স্কদের এক এক করে প্রণাম করে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশায় উঠল পৃথা। দুটো রিকশার অন্যটায় প্রণবকুমার বসে ছিল। শ্বশুরমশাই বললেন, 'দুর্গা—দুর্গা।'

পৃথা অবাক হয়ে ভাবছিল পূর্ণিমা কোথায় গেল? আজ সকাল থেকে সে তার ঘরে আসেনি, একবারও দেখতে পায়নি তাকে।

বাস ছেড়ে দিল। দীর্ঘ পথ। কাল বিকেল বেজে যাবে। পৃথা বসেছিল লেডিস সিটে, ওপাশে প্রণবকুমার। বাসে ওঠার সময় সে ঘোমটা সরিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, পূর্ণিমাকে দেখতে পায়নি। তা হলে কি পূর্ণিমার যাওয়া বাতিল হয়েছে? একটু একটু করে স্বস্তি ফিরে আসছিল। সন্ধের মুখে বাস একটা জনপদে থামলে প্রণবকুমার এগিয়ে এল, 'আমার পাশের

সিট খালি হয়েছে, ইচ্ছে করলে বসতে পারো।'

ইচ্ছে হল। দ্রুত উঠে দাঁড়াল পৃথা। জানলায় পাশের সিটে বসতেই ঘোমটা পড়ে গেল খোঁপার ওপর। সেদিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো প্রণবকুমার বলল, 'বাঃ।' মুখ নিচু করল পৃথা। প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু খাবে? নিয়ে আসব?'

ঘাড় নাড়ল পৃথা। প্রণবকুমার নীচে নেমে গেল। পৃথার মনে হল মানুষটা খারাপ নয়। তাকে শ্বশুরবাড়িতে না ফেলে রেখে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাতের বেলায় ও যেরকম ভয়ংকর হয়ে ওঠে তা মোটেই ভাল লাগে না তার। এখন অবশ্য তার শরীরে তেমন যন্ত্রণা হয় না, কিন্তু ওই সময়টুকুতে লোকটা কীরকম পশু হয়ে যায়। লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রমবোধ হারিয়ে ফেলে। তা হলে মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়?

শিঙাড়া-সন্দেশ নিয়ে ফিরে এল প্রণবকুমার। অনেকগুলো। পৃথা মাথা নাড়ল, 'আমি একটার বেশি খেতে পারব না।'

'তাই খাও। আমার খিদে পেয়েছে।'

গোটা পাঁচেক শিঙাড়া লোকটা বেমালুম খেয়ে নিল। সন্দেশও তিনটে। বাড়ি থেকে আনা ফ্লাস্ক খুলে খানিকটা জল গলায় ঢেলে এগিয়ে ধরল পৃথার দিকে। সন্দেশের পর জল খেয়ে পৃথা বাইরের দিকে তাকাতেই বাস ছেড়ে দিল।

'কেমন লাগছে? খুব খুশি তো?'

পৃথা বুঝল না কী জবাব দিলে ঠিক হবে।

'আমি অবশ্য কালকের রাতটা তোমাদের বাড়িতে কাটিয়ে সকালের বাস ধরে কুচবিহার চলে যাব। ওখান থেকে পুনে কত দূর জানো?'

'না।' অস্ফুট উচ্চারণ করল পৃথা।

'তিনদিন তিনরাত ট্রেনেই কেটে যাবে। একা একা যাওয়া, কী বোরিং।'

অনেকটা সময় চুপচাপ কাটানোর পর পৃথা আর মুখ না খুলে পারল না, 'উনি সঙ্গে যাবেন বলেছিলেন!'

'কে?'

'পূর্ণিমাদি।'

'তোমাকে বলেছে সে?'

'হ্যাঁ।'

হাসল প্রণবকুমার, 'আমি তো শুনিনি। কেউ কিছু বলেনি।'

'সেকী!'

'হ্যাঁ। ও বলল আর তুমি ভাবলে আমার সঙ্গে পুনে যাচ্ছে। বাবা কখনও অ্যালাউ করতে পারে! ও তো মায়ের পেটের বোন নয়।' হাসল প্রণবকুমার, 'ওর একটা অসুখ আছে।'

'কী অসুখ?

'স্বপ্ন দেখার। ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দ্যাখে আর ভাবে বাস্তবে সেটা ঘটবে।' হাত নেড়েছিল প্রণবকুমার, 'এই বাড়িতে বৈধব্যজীবন যাপন করতে হচ্ছে তো! মাছ-মাংস খেতে দেওয়া হয় না। আমি ওসব মানি না বলে লুকিয়ে চুরিয়ে খাইয়ে দিই। হয়তো স্বপ্ন দেখেছিল যদি সে পুনে যায় তা হলে সধবা অবস্থায় যেমন ছিল তেমন থাকতে পারবে। ওখানে তো না বলার জন্যে কেউ নেই। আর একবার স্বপ্ন দেখলেই হল, সত্যি ভেবে নিয়ে তোমাকে ওসব বলেছে। পাগল!'

পৃথার কানে শেষ কথাগুলো যাচ্ছিল না। পূর্ণিমাকে যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না এটাই স্বস্তির।

ডাক্তারবাবু তখনও চেম্বারে। মায়াবতী জামাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এখন যা রাত তাতে জলখাবার খেলে আর রাতের খাবার দেওয়া যাবে না। প্রণবকুমারকে স্নানের ঘরে পৌঁছে দিয়ে তিনি দ্রুত চলে এলেন বড় মেয়ের কাছে, 'পইপই করে বললাম আজ তুমি চেম্বারে যেয়ো না তবু কথা কানে নিল না। জামাই তো খারাপ ভাবতেই পারে! শ্বশুরের এত টাকা দরকার যে সে আসছে জেনেও চেম্বার করছে।'

নীতা গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা এসে পড়ল বলে! তা ছাড়া তুমি আছ, আমরা আছি, জামাইবাবুর অসুবিধে হচ্ছে কোথায়!'

মায়াবতী ধমকালেন, 'চুপ কর। হ্যাঁরে পৃথা, এই সময় জামাই কী খায় রে?'

'জানি না।'

'জানি না মানে? তুই দেখিসনি?'

'না।'

নীতা বলল, 'এই সময় জামাইবাবু যদি বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে তা হলে দিদি দেখবে কী করে?'

পৃথা বলল, 'তা নয়। উনি সকালে ঘুম ভাঙার পর সেই যে বেরিয়ে যেতেন তারপর গোটা দিনে দেখা দিতেন না। শুতে আসতেন রাতের খাবার খেয়ে।'

'ওম্মা! কারণটা কী?'

'ওঁদের বাড়িতে পুরুষ আর মহিলার রাতের শোওয়ার সময় ছাড়া একসঙ্গে থাকা নিষেধ। তাই উনি কখন কী খাচ্ছেন আমি জানব কী করে!' পৃথা বলেছিল।

'অদ্ভুত বাড়ি।'

নীতা বলল, 'ঠিক আছে, আমি জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছি।

এই বাড়ি আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। গ্রামাফোনের বাক্সটাকে দেখে বুকের ভেতর হু হু করে উঠল পৃথার। কত দিন গান শোনা হয়নি। এখন যদি বাজায় তা হলে মা রেগে যাবেই। প্রণবকুমারের তো রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ নয়।

সে চুপচাপ বাইরের বারান্দায় চলে ।ল। সামনের চিলতে মাঠের ওপাশে যে রাস্তাটা সেটা আধা অন্ধকারে ঢাকা। এত রাত্রে গাড়ি বা সাইকেল দূরের কথা, কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না ওখানে। পৃথা খালি পায়ে মাঠে নামল। নামতেই চোখ গেল ওপরে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। তার খেয়াল হল, শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় সে কোনও রাতে আকাশ দ্যাখেনি। চোখ নামাতেই দূরে শরীরটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। সাদা কাপড় থাকায় কিছুটা ভৌতিক বলে মনে হলেও হাঁটার ভঙ্গিটা পৃথিবীর অন্য মানুষের হতে পারে না। পৃথা কোনও কিছু না ভেবে দৌড়াল। তারপর দু'হাতে ডাক্তারবাবুকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে কেঁদে উঠল। ডাক্তারবাবু কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন,

তাঁর কণ্ঠ কান্নায় বন্ধ।

প্রায় মিনিটখানেক লাগল সামলে উঠতে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছিস মা?'

মাথা নাড়ল পৃথা, 'ভাল না, একটুও ভাল না।'

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? ওরা কি খারাপ ব্যবহার করেছে?'

'ওদের বাড়িতে কেউ রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের গান তোমার জামাই পছন্দ করে না। ওদের বাড়িতে এই কয়দিনে একটাও গান বাজেনি।' মেয়ে আবার কেঁদে ফেলল বাপের বুকে মুখ রেখে।

ডাক্তারবাবুর এখন মনে হল মায়াবতী ঠিক কথাই বলতেন। মেয়েকে যদি এভাবে বড় না করতেন তা হলে এই কষ্টটা ও পেত না। তিনিই এর জন্যে দায়ী। ডাক্তারবাবু বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে রে, ধৈর্য ধরে থাক।'

'ঠিক হবে না। ওদের বাড়িতে বই পড়ারও চল নেই।'

'সেকী!'

'হ্যাঁ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ওখানে থাকতে।'

'বুঝতে পারছি।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর শ্বশুর-শাশুড়ি?'

'শ্বশুর বাইরের দিকে থাকতেন। কিন্তু শাশুড়ির কথা কিছুই বুঝতে পারতাম না। একজন বুঝিয়ে দিল। উনি যেসব কথা বলতেন তা একশো বছর আগের শাশুড়িরা বলত। তুমি আমাকে কেন ওই বাড়িতে পাঠালে?' মেয়ে মুখ তুলল।

সেই নির্জন রাস্তায় পাতলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু অসহায় চোখে মেঘেদের দেখলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের শব্দ বেড়ে যাচ্ছিল। কোনওমতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জামাই, জামাই কীরকম ব্যবহার করেছে?'

শ্বাস ফেলল পৃথা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার জন্যে বই কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দু'দিন দোকান থেকে জলখাবার আনিয়ে দিয়েছিল।'

'কেন? ওখানকার জলখাবার কি ভাল ছিল না?'

'ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ফ্যানাভাত খেতে আমার একটুও ভাল লাগত না।'

বুকের শব্দ জামাইয়ের কথা শোনার পর একটু একটু করে শান্ত হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, তাই না?'

'আমাকে ওর সঙ্গে পুনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। শাশুড়ি রাজি হয়নি।'

'আজ হয়নি, কাল হবে। তোকে সে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।'

'আমি জানি না।'

'দ্যাখ জামাই তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, অসম্মান করেনি, তোর জন্যে বই এনে দিয়েছে। সে-ই তো তোর সব। ওর বিরুদ্ধে তোর তো কোনও অভিযোগ নেই!'

'আছে।'

'আছে?' হকচকিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করেনি। আমি কী পছন্দ করি জানতে চায়নি। শুধু রাত্রে শুতে আসত। ভোর হলেই বেরিয়ে যেত। আমার ওকে মাঝে মাঝেই পশুর মতন মনে হত।' বলেই কেঁদে ফেলল পৃথা, 'আমি কী করব?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আছি মা।' ডাক্তারবাবুর কথার মাঝখানেই গাড়ির হেডলাইটের আলো রাস্তা আলোকিত করে ছুটে আসছিল। একেবারে সামনে এসে জিপটা দাঁড়িয়ে গেল। নীচে নেমে এল অনুপ, 'ও, আপনারা! দূর থেকে দেখে বুঝতে পারিনি।' তারপর দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু হয়েছে?'

'না না। আজ পৃথা দ্বিরাগমনে এল তো, তাই—!' ডাক্তারবাবু কথা শেষ করলেন না।

'ও! আচ্ছা চলি।' অনুপ জিপ নিয়ে চলে যেতেই অন্ধকার হুড়মুড়িয়ে চারধার ঢেকে দিল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'চল। বাড়ি চল।'

বাবার হাত ধরে হাঁটছিল পৃথা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ডাক্তারবাবু নিচু গলায় বললেন, 'শোন, এ সব কথা যা আমায় বললি তা আর কাউকে বলিস না!'

'কীসব কথা?' পৃথা চোখ তুলল।

'ওই যে জামাইয়ের সম্বন্ধে যা বললি।'

পৃথা নিচু গলায় বলল, 'বাবা, আমি আর ছোট নই, এই কয়দিনে অনেক বড় হয়ে গেছি।' সে বাবার হাত ছেড়ে দিল।

কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগল না ডাক্তারবাবুর।

প্রণবকুমার চলে গেল সকাল আটটার বাস ধরে। যাওয়ার আগে লুচি বেগুনভাজা, আলুর তরকারি আর মাংস খেয়ে বলেছিল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে।'

নীতা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোন বাড়ির রান্না ভাল?'

মায়াবতী ধমক দিয়েছিলেন, 'ছিঃ। এরকম কেউ জিজ্ঞাসা করে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা। আমার মেজমেয়েটা খুব বাচাল।'

প্রণবকুমার হেসে বলেছিল, 'একজন বোবা হলে আর একজনকে বাচাল হতেই হবে।'

নীতা প্রতিবাদ করেছিল, 'আমার দিদি মোটেই বোবা নয়।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাবা বলেছেন কাউকে পাঠিয়ে পৃথাকে নিয়ে যাবেন। সেটা কবে তা কি তুমি জানো?

'না। আন্দাজ করছি আর দুটো রাত পরে।'

দিন সাতেক যদি ও থাকে তা হলে কি অসুবিধে হবে?'

'দেখুন, আমি আমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলি না।'

মায়াবতী বললেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। আজকাল এমন ছেলে খুব কম দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে তুমি পৃথাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হত। মানে এক্ষুনি নিয়ে যেতে বলছি না, কয়েক মাস পরে ও যখন ভাল রাঁধতে শিখে যাবে তখন নিয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার সুবিধে হবে।'

'মা চাইছেন ও আমাদের সংসারের একজন হয়ে যাক। সেটা হতে হলে ওখানে থাকতে হবে। দেখি—।' কথা শেষ করেনি প্রণবকুমার।

সকাল দশটায় গ্রামাফোনের বাক্স খুলল পৃথা। সারা শরীরে কাঁটা ফুটে উঠল। আদরের আঙুল বোলাল যন্ত্রটার ওপর। তারপর রেকর্ডটা তুলে দিয়ে হাতল ঘোরাল কিছুক্ষণ। পিনটা নামিয়ে দিতেই গান বেজে উঠল।

চোখ বন্ধ করল পৃথা, শরীরে রোমাঞ্চ। 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে/ তখন কে তুমি তা কে জানত।/ তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,/ জীবন বহে যেত অশান্ত।' বুকের মধ্যে আকাশটা তৈরি হয়ে গেল। সেই আকাশের ভোরবেলায় সখার ডাকে কত না বন-বনান্ত ছুটে বেড়ানো। গান শেষ হলে চুপ করে বসে রইল পৃথা। 'খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি/ স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,/ তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত/ ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।'

দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকতে মায়াবতী বড় মেয়েকে শোওয়ার ঘরে ডেকে নিলেন। একটা জরুরি কল পেয়ে ডাক্তারবাবু পেশেন্ট দেখতে বেরিয়ে গেছেন। দুই বোনকে নিয়ে নীতা ওপাশের ঘরে শুয়ে আছে।

মায়াবতী বললেন, 'এখানে এসে বস।'

পৃথা বসল। প্রণবকুমার চলে যাওয়ার পরেই তার পোশাক বদলে গিয়েছে। বিয়ের আগে যে গোড়ালিঢাকা স্কার্ট আর জামা পরত তাই পরে সে এখন বেশ স্বচ্ছন্দ। মায়াবতীও কিছু বলেননি।

মায়াবতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কেমন রে?'

'ভাল।' পৃথা জবাব দিল।

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন মায়াবতী, 'শাশুড়ি? কথা বুঝতে পেরেছিস?'

'একটু একটু।'

'তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'ওমা! খারাপ ব্যবহার কেন করবে?' শাসল পৃথা।

'বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'অনেকে। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়নি।'

'তোর কাছাকাছি বয়সের কোনও মেয়ে আছে?'

'না। তবে আমার চেয়ে একটু বড় একজন আছে। ওর দূর সম্পর্কের বোন। অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে গেছে। ও আমাদের ভাষায় কথা বলে।'

'দেখতে শুনতে কেমন?'

'খুব ভাল।'

'আবার বিয়েথা করবে?'

'জিজ্ঞাসা করিনি।'

'কী খেতিস?'

'যা বাড়িতে হয়। ভাত ডাল তরকারি মাছ বা মাংস।'

'রান্না কেমন?'

'ভাল!'

'হুঁ। জামাই কেমন?' তাকালেন মায়াবতী।

'ভালই।'

'ভালই মানে? তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'না-না।'

'সে চলে গেল পুনে। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে। আর তুই পড়ে থাকবি শিলচরে। দেখো, এখনই বাচ্চাকাচ্চা যেন না হয়।'

পৃথা জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে বসে থাকল।

মনে মনে রেগে গেলেন মায়াবতী। এই মেয়ের পেট থেকে কথা বের করা মুশকিল। তবু বললেন, 'এখন তোর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তোকে জিজ্ঞাসা করা যায়। তোদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সব সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে?'

'হুঁ!'

'সর্বনাশ। বাচ্চা না হওয়ার জন্যে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছিল জামাই?'

'আমি জানি না, ওসব কথা আমাকে বলেনি।'

'বলেনি? হাঁদা কোথাকার! তুই মনে করিয়ে দিলি না কেন?'

'তোমরাও তো আমাকে বিয়ের আগে কিছু বলোনি!'

'গত মাসে তোর কবে শরীর খারাপ হয়েছিল?'

মনে করে তারিখটা বলল পৃথা। সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করতে বসলেন মায়াবতী। আঙুলের কর গুনে যোগবিয়োগ করার পর তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'মনে হচ্ছে বেঁচে গেলি। ভগবান, তোমাকে আমি সওয়া পাঁচ আনার পুজো দেব, দেখো।'

'আমি যাচ্ছি।'

দ্রুত গ্রামাফোনের ঘরে চলে এল পৃথা। মায়াবতীর হিসেবটা সে ঠিক বোঝে না কিন্তু প্রণবকুমার নিশ্চয়ই বোঝে। তা হলে বুঝেও প্রণবকুমার

এমন কাজ নিশ্চয়ই করবে না যা তাকে সাততাড়াতাড়ি মা বানিয়ে দেবে। সে শিলচরে পড়ে থাকবে বাচ্চা নিয়ে? গত রাতেও লোকটা তাকে ছাড়েনি। তবে এটা শ্বশুরবাড়ি বলেই বোধহয় বেশি সময় নেয়নি। শিলচরে যা মেনে নিয়েছিল এখানে তা মানতে খুব খারাপ লেগেছে। একসময় ভেবেছিল প্রতিবাদ করবে কিন্তু সেটা করলে মা বাবা জানতে পারবে বুঝে দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছিল।

রবীন্দ্রনাথের গান বাজাল সে প্রসঙ্গটা মাথা থেকে তাড়াতে। রেকর্ড না বেছে যেটা হাতে উঠল সেটাই চাপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ শোনা গেল, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে/ নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।'

শোনামাত্র প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পিন তুলে নিয়ে গানটা থামিয়ে দিল পৃথা। একা। তার সর্বাঙ্গে এখন কদমফুল। এই গান সে অনেকবার শুনেছে কিন্তু কখনও এরকম অনুভূতি হয়নি। তখন মনে হত রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের উদ্দেশে ওই গান লিখেছিলেন। সে দরজার দিকে তাকাল। না, কেউ নেই। কেউ কি শুনেছে? এই গান তো সে ফুলশয্যার পরে যেদিন সক্রিয় হয়ে প্রণবকুমার তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল সেদিনের অনুভূতির গান।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে রইল সে।

'অ্যাই দিদি? কাঁদছিস?' নীতা কাছে এসে দাঁড়াল।

'ভ্যাট।' হাত সরিয়ে রেকর্ডটা খাপে ভরে বাক্সের একেবারে নীচে ঢুকিয়ে দিল পৃথা। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'ওইভাবে বসে ছিলি কেন?'

'এমনি।'

'তুই না কেমন বদলে গিয়েছিস!'

'দূর! আমি কেন বদলাব?'

'আয়নায় মুখ দেখিস না? তোর চোখের তলায় আগে কালি ছিল?'

পৃথা দ্রুত সন্ধ্যা মুখার্জির রেকর্ডটা চাপিয়ে দিল, 'হয়তো কিছুই নাহি পাব, তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাব!'

নীতা হেসে ফেলল, 'তা হলে বোঝ!'

'মানে?'

'বিয়ের আগে তুই এই গানটা খুব অপছন্দ করতিস।' নীতা বলামাত্র

গানের আওয়াজ ছাপিয়ে কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে এল। নীতা ছুটে গেল দরজা খুলতে। গান বন্ধ করল পৃথা। তার মাথার মধ্যে লাইনটা পাক খাচ্ছিল, 'কাঁদালে তুমি মোরে, ভালবাসারই ঘায়ে—!'

দরজা খুলল নীতা। দেখল শিবানীদিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, 'এসো।'

'তোর জামাইবাবু দিদিকে নিয়ে চলে গেল?' শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন।

'না তো। জামাইবাবু একাই পুনে চলে গেছে আজ। এখন অন্তত এক বছর দিদিকে শ্বশুরবাড়িতে ট্রেনিং নিতে হবে। ওর শাশুড়ির অর্ডার!' নীতা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'মা, শিবানীদিদিমা এসেছেন।'

গ্রামাফোনের বাক্স বন্ধ করে পৃথা বাইরের ঘরে যাওয়ার আগেই মায়াবতী পৌঁছে গেলেন, 'আসুন আসুন, কয়েক দিন তো আপনাকে দেখতেই পাইনি।'

'কী করে পাবে? কুচবিহারে আমার যে বোন থাকে তার শরীর খারাপ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম যে। আজ ছেলে গিয়ে নিয়ে এল।'

'ও, তাই বলুন। কাল অনেক রাতে মেয়ে-জামাই এল। জামাইয়ের অফিস থেকে ডাক এসেছে, ছুটি বাতিল। তাই একটা রাত এ বাড়িতে ঘুমিয়ে সকালে ছুটল বাস ধরতে। এ কেমন দ্বিরাগমন কে জানে!' মায়াবতী কাঁধ নাচাল।

পৃথার দিকে তাকালেন শিবানী, 'কী রে! এখন কিছু দিন থাকবি তো?'

'আমি কিছু জানি না!' পৃথা বলল।

'ওর শ্বশুর লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে ওকে। সংসার করতে শেখাবে। এখন তো আমাদের কথা খাটবে না। গোত্রবদল হয়ে গেছে, ওদের জোর অনেক বেশি। একী! আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসুন। চা খাবেন তো!' মায়াবতী বসলেন না।

'না না। চা খাব না। আমি চলি।' চঞ্চল হয়ে উঠলেন শিবানী।

তাঁকে এগিয়ে দিতে রাস্তার কাছাকাছি চলে এলেন মায়াবতী। শিবানীমাসিকে ঠিক অন্য দিনের মতো স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না তাঁর।

'আপনি কাল এখানে থাকলে জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।'

'বিয়ের সময় তো আলাপ হয়েছিল।'

'তখন তো লোকের ভিড়, ভাল করে কথা বলতে পারেননি। ছেলেটি বেশ ভাল।'

'বাঃ। ওর বাড়ির লোকজন পৃথাকে ভালভাবে নিয়েছে তো?'

'দেখুন, মেয়েকে যাই জিজ্ঞাসা করি, বলে, ভাল। যেন শ্বশুরবাড়ির নিন্দে করবে না বলে পণ করেছে। এ মেয়ে তো আমার কাছে কখনও মনের কথা খুলে বলে না।'

'হ্যাঁ। খুব চাপা মেয়ে।'

'ওটা আমার কাছে। বাপের কাছে গেলে খই ফোটে।'

শিবানী ডাক্তারবাবুর মুখ মনে করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কোথায়?'

'জরুরি কলে গেছেন। ফিরে আসার সময় হয়ে গেল।'

'আমি যাই।'

শিবানী আর দাঁড়ালেন না। মিনিট সাতেক হাঁটলেই তাদের কোয়ার্টার্স। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। অনুপ কখনও ভুল দেখবে না। আজ সকালে তাঁকে নিয়ে আসতে কুচবিহারে গিয়েছিল অনুপ। রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় সে দেখেছে একটা রিকশায় প্রণবকুমার আর একজন ঘোমটা মাথায় মহিলা বসে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। দূর থেকে মহিলার মুখ দেখতে পায়নি সে মাথা ঘোমটায় ঢাকা ছিল বলে। কিন্তু প্রণবকুমারের সুন্দর চেহারা চিনতে ভুল করেনি। পেছনের আর একটা রিকশায় কয়েকটা সুটকেস ছিল। অতএব সে ভেবে নিয়েছিল প্রণবকুমার আর পৃথা কোথাও যাচ্ছে। শিবানী খবরটা জেনে বলেছিলেন, 'ওমা! মাত্র একরাত থাকল দ্বিরাগমনে এসে। এই সময় মেয়েরা বাপের বাড়িতে ক'দিন থেকে সুখ পায়। জামাইও শ্বশুরবাড়ির মানুষদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নেয়।' তারপর ভেবেছিলেন হয়তো আজ সকালেই ওরা শিলচর থেকে এসেছে। অনুপ ভেবেছে ওরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, হয়তো ওরা যাচ্ছিল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে। নতুন বউকে নিয়ে প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে জামাই রিকশায় যেতেই

পারে। প্রণবকুমারকে চিনতে ভুল করবে না অনুপ। সে পুনে গিয়ে আলাপ করেও এসেছে।

অথচ তিনি নিজের চোখে পৃথাকে দেখে এলেন। কী কাণ্ড! তা হলে রিকশায় প্রণবকুমারের পাশে যে বসে ছিল সে কে? ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছিল শিবানীর। কথাটা তিনি মায়াবতীকে বলতে পারেননি। যতই কথা বলে আসুক, মানুষের তো কখনও কখনও দৃষ্টিবিভ্রম হয়। হয়তো লোকটা প্রণবকুমারের মতো দেখতে, প্রণবকুমার নয়। হওয়ার কথাও নয়। যে ছেলে নতুন বউকে দ্বিরাগমনে এসে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কর্মস্থলে যাচ্ছে তার পাশে রিকশায় অন্য মেয়েমানুষ বসে থাকবে কী করে? প্রণবকুমার এদিকের ছেলে নয়। হুট করে কোনও মেয়ে তার রিকশায় উঠতে যাবে কেন?

বাড়ি ফিরে শিবানী দেখলেন অনুপ চুপচাপ বসে আছে। তাঁকে দেখে বলল, 'কোথায় ছুটলে অমন করে? আমি বেরুতে পারছি না।'

'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'ও। এখনও খুব কান্নাকাটি চলছে?' অনুপ হাসল।

'আচ্ছা, ভেবে বল তো, তুই রিকশায় প্রণবকুমারকে দেখেছিলি?'

মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল অনুপ, 'মানে?'

'তুই আবার মনে করে দ্যাখ।'

'আশ্চর্য! লোকটাকে দেখে আমি চিনতে পারব না। ওর সঙ্গে পুনেয় গোটা দিন কাটিয়েছি। ভাবলাম ওঁকে ডাকি কিন্তু রিকশাটা বেশ জোরে বেরিয়ে গেল। উনি অবশ্য আমাকে দেখতে পাননি।' অনুপ বলল।

'ওর পাশে পৃথা বসে ছিল।'

'হ্যাঁ। মাথায় ঘোমটা দেওয়া। নতুন বউরা যেরকম দিয়ে থাকে।'

'তুই স্টেশনে গিয়ে কথা বললি না কেন?'

'আরে। আমি স্টেশনে যেতে যাব কেন? কোনও জরুরি কথা বলার থাকলে হয়তো যেতাম। অকারণে যেতে যাব কেন?'

বসে পড়লেন শিবানী, 'আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

অনুপ চলে এল মায়ের পাশে, 'কী হয়েছে মা?'

'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখি পৃথা এখানেই আছে।'

'সেকী!' চমকে উঠল অনুপ।

'জামাই কাল এসে ওকে রেখে গেছে। দু'দিন পরে লোক এসে ওকে নিয়ে যাবে শিলচরে। আজ সকালের বাসে জামাই কুচবিহার হয়ে পুনেয় চলে গেছে। ওর অফিস থেকে জরুরি ডাক এসেছে।' শিবানী বললেন।

মাথা নাড়ল অনুপ, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তা হলে ওই মহিলা কে?'

'দ্যাখ বাবা, ভেবে দ্যাখ। তোর যদি ভুল হয়—।'

'মা, আমার ভুল হয়নি। লোকটার পরনে নীল ফুলহাতা শার্ট ছিল। মহিলা পরেছিলেন কমলা রঙের শাড়ি। ইস, ওর মুখটা যদি দেখতে পেতাম?'

'কিন্তু প্রণবকুমারদের আর কোনও আত্মীয়স্বজন এ দিকে থাকে না রে।'

'যাক গে। তুমি এই ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। বলতে তো প্রমাণ দেওয়া যাবে না।' অনুপ বলল।

'আমি ভাবি মেয়েটার কথা। অত ভাল মেয়ের কপালে কী লেখা আছে ঈশ্বর জানেন।' শিবানী চোখ বন্ধ করলেন।

কিন্তু পরের দিন বিকেলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে না গিয়ে পারলেন না। ভেতরের ঘরে তখন গান বাজছে, 'সুদূর কোন নদীর পারে/ গহন কোন বনের ধারে/ গভীর কোন অন্ধকারে/ হতেছ তুমি পার/ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

ডাক্তারবাবুই দরজা খুললেন, 'আরে, আসুন, আসুন। কেমন আছেন।'

'ভাল। মেয়ে আসার পরে মনটা বেশ ভাল লাগছে?'

গলা শুনে মায়াবতী এই ঘরে আসতে আসতে বললেন, 'ওরে, একটু বন্ধ কর। তখন থেকে গানের পর গান বাজিয়ে যাচ্ছিস!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আহা। বাজাক না। ওখানে শুনতে পায়নি।'

মায়াবতী বললেন, 'তা হলে যন্ত্রটাকে প্যাক করে ওর সঙ্গে দিয়ে দিয়ো।'

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কবে লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে?'

'এখনও কোনও ফোন বা চিঠি আসেনি। হয়তো কালই হুট করে কেউ এসে যাবে।'

'যার তার সঙ্গে ওকে পাঠাবেন না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না না, নিশ্চয়ই দায়িত্ববান কাউকে পাঠাবেন প্রাণকুমারবাবু।'

অনেকটা সময় গল্প করলেন শিবানী পৃথার সঙ্গে ভাষা নিয়ে। রসিকতাও করলেন। বললেন, 'জড়িয়ে টেনে উচ্চারণ করে বলে তুই বুঝতে পারিসনি। কান খাড়া করে শুনলে ঠিক বুঝতে পারবি।'

ওঠার সময় মায়াবতীকে একা পেয়ে বললেন, 'তোমার জামাইকে অনুপ কুচবিহারে দেখেছিল কিন্তু কথা বলতে পারেনি।'

'ওমা! কেন?'

'রিকশায় ছিল প্রণবকুমার, তাই। আমি বললাম, ঠিক দেখেছিস তো? ও রেগে গেল, চেনা লোককে চিনব না? বলল, নীল শার্ট পরেছিল প্রণবকুমার। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।'

হেসে মাথা দোলালেন মায়াবতী, 'হ্যাঁ, ঠিকই। ও নীল শার্ট পরে গেছে।'

পাছে ধরা পড়ে যান তাই মায়াবতীর মুখের দিকে তাকালেন না শিবানী। বাড়ি ফিরতে ফিরতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে বোঝালেন তাঁর কিছু করার নেই। কিন্তু মেয়েটা কে? শিবানীর মাথা ঝিমঝিম করছিল।

প্রাণকুমার ভেবেছিলেন তাঁর আশ্রিত এক কাকাকে পাঠাবেন পৃথাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু বৃদ্ধ যাওয়ার আগের দিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে সমস্যায় পড়লেন তিনি। এমনিতে 'দিন ধরে বাড়িতে আর একটি ব্যাপার নিয়ে ঘোরতর অশান্তি চলছে। উপায় না খুঁজে পেয়ে প্রাণকুমার প্রবালকে ডেকে পাঠালেন।

প্রাণকুমারকে অত্যন্ত সমীহ করে প্রবাল। বলা ভাল, ওঁর সামনে সে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। প্রবাল এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালে প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাজকর্মের কিছু হল?'

'এখনও হয়নি।'

'কবে হবে জানি না। যাক গে, তুমি গিয়ে তোমার বউদিকে নিয়ে আসতে পারবে? এখান থেকে বাসে যাবে। পৌঁছে আবার রাত্রের বাস ধরে ফিরে আসবে। ওখানে রাত্রিবাস করার কোনও দরকার নেই। পারবে?'

'পারব।'

'ওখানে গোটা দিন থাকতে হবে তোমাকে। এমন কিছু করবে না যা আমাদের অসম্মানিত করে। মনে থাকবে তোমার?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল প্রবাল।

'এ বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে বলবে সবাই ভাল আছে।'

'বলব।'

'পূর্ণিমার নাম ঘুণাক্ষরে উচ্চারণ করবে না।'

একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নিল প্রবাল, 'ঠিক আছে।'

'পূর্ণিমা কোথায় গেছে আমরা কেউ জানি না। সে এই বাড়িতে থাকত। বাড়ি থেকে একটা সোমত্থ বিধবা মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে একথা কাউকে বলা মানে মাথা নিচু করা। দেখো, যেন ভুল না হয়।'

প্রবাল চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বউদি যদি জিজ্ঞাসা করে তা হলেও কি বলব না?'

'কী বলবে তুমি? কী বলতে পারো?'

'ওই যে, ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রণবদাদা যেদিন সকালে চলে গেলেন সেদিন সন্ধের পর থেকে ওঁকে আর দেখা যায়নি।'

'ওঃ। না। খবরদার! বউমা যেন এসব জানতে না পারে।'

'তা হলে যদি জিজ্ঞাসা করেন—!'

'বলবে ওর শ্বশুরবাড়ির লোক এসে নিয়ে গেছে ওকে। এখন থেকে সে সেখানেই থাকবে। বিয়ের পর তো স্বামীর বাড়িটাই মেয়েদের জায়গা হয়। বিধবা হলেও তো সেই অধিকারটা চলে যায় না। এত কথা বলার দরকার নেই। শুধু বলবে সে শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছে—।'

'বেশ, তাই বলব।'

'যাও তৈরি হও।'

ঘরের এক কোণে বসে প্রাণকুমারের স্ত্রী এসব কথা শুনছিলেন। এবার স্বামীকে দ্রুত কিছু বললেন।

প্রাণকুমার সেটা শুনে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ানো প্রবালকে ডাকলেন, 'শোনো। ওখানে নেমেই রাতের বাসের টিকিট অগ্রিম কেটে নেবে। তা হলে চিন্তা থাকবে না। বউমার টিকিট কাটবে লেডিস সিটে। তিনি অন্য মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে আসবেন। খেয়াল থাকবে?'

'থাকবে।'

'তিনি নতুন বউ। বেশি কথা তাঁর সঙ্গে বলার দরকার নেই। রাস্তায় কিছু কিনে খেয়ো না। বেয়ানকে বলবে খাবার করে দিতে। আমি বাসটার্মিনাসে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।' প্রাণকুমার হাত নেড়ে চলে যেতে বললেন।

সাতসকালে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলেছিল নীতা। তারপর বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কী চাই?'

প্রবাল বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'বউদি আছেন?'

'কে বউদি? আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'আমি প্রবাল, শিলচর থেকে এসেছি। এটা তো ডাক্তারবাবুর বাড়ি! ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার এক দাদার বিয়ে হয়েছে!'

'শিলচর থেকে!' হাসি পেল নীতার, 'কী জন্যে এসেছেন?'

'ওঁকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে।'

'কী করে বিশ্বাস করব? কোনও চিঠি আছে সঙ্গে?'

'চিঠি?'

'এমন কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন যা দেখে বুঝব আপনি সত্যি বলছেন!'

'না মানে, বউদিকে ডাকুন, উনি আমাকে চিনতে পারবেন।'

'এখানে এসে বসুন।'

বাইরের ঘরে বসতে বলে নীতা প্রায় দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে এসে বেশ জোরেই হাসতে লাগল। পৃথা এবং মিতা তখনও শুয়ে ছিল, মিতা জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই মেজদি, হাসছিস কেন?'

পৃথা চোখ খুলে বোনের রকমসকম দেখে উঠে বসল, 'অ্যাই?'

'হ্যাঁরে দিদি, শিলচরে তোর একটা ক্যাবলাকান্ত দেওর আছে?'

'ক্যাবলাকান্ত?'

'হ্যাঁ রে! সে এসেছে। নাম বলল, প্রবাল।'

শোনামাত্র বিছানা থেকে নেমে পড়ল পৃথা! 'যাঃ। সত্যি?'

'হ্যাঁ রে! বলল, বউদিকে ডাকুন, উনি আমাকে চিনতে পারবেন। একদম আমাদের মতো বাংলায় বলল রে।'

বাথরুমে ঢুকে মুখে চোখে জল বুলিয়ে গামছায় মুছে পৃথা দৌড়াল। তাকে দেখে জড়সড় হয়ে বসে থাকা প্রবাল উঠে দাঁড়াল, 'আমি এসেছি।'

'ও মা! বসো বসো। আর কে এসেছেন?' পৃথা হাসল।

'আর কেউ নয়। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার।'

'বাব্বা। কত বড় দায়িত্ববান ব্যক্তি! বসো। বাড়ির খবর ভাল তো?'

'হ্যাঁ। সব ভাল।' গম্ভীর হয়ে গেল প্রবাল। তারপর মনে পড়তে একটা বেতের বাস্কেট যেটা সে দরজার বাইরে রেখে ঢুকেছিল, ভেতরে এনে রাখল, 'এটা এ বাড়ির জন্যে। ও বাড়ি থেকে দিয়েছে।'

'রাত্রে বাসে ঘুম হয়েছিল?'

'ওই আর কী!'

'খুব খিদে পেয়ে গেছে, তাই না?'

'না না। ঠিক আছে।'

এই সময় মায়াবতী এবং ডাক্তারবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পৃথা, 'এ হচ্ছে তোমাদের জামাইয়ের দুঃসম্পর্কের ভাই। খুব ভাল ছেলে। নাম প্রবাল। ওখানে আমাকে লুকিয়ে খাবার এনে দিত, বই জোগাড় করে দিত। ওঁরা ওকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে!'

মায়াবতী গালে হাত রাখলেন অজান্তেই, 'ওমা! একী কথা! ওইটুকুনি ছেলেকে একা পাঠিয়েছে তোকে অত দূরে নিয়ে যেতে!'

প্রবাল ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম সারতে ব্যস্ত ছিল। ডাক্তারবাবু হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রেখে বললেন, 'থাক থাক। তোমার সঙ্গে আর কাউকে পাঠায়নি বাবা?'

'না।'

'রাস্তাঘাট তো ভাল নয়। অতদূরের পথ। বয়স্ক ভারিক্কি মানুষ গার্জেন হিসেবে না গেলে চিন্তার কারণ হয়। বসো। এতটা পথ এসেছ। কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন?'

'না।'

'একী কথা! তোমার হাতে একটা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল প্রাণকুমারবাবুর।'

'মানে, উনি লিখেছিলেন, আমি তাড়াহুড়ো করে আনতে ভুলে গিয়েছি।'

'তোমার বয়সে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তা হলে বোঝো, তুমি একটা চিঠি নিয়ে আসতে যদি ভুলে যাও তা হলে পৃথামাকে নিয়ে যেতে কত কী ভুল করতে পারো!' বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু, 'বেচারা রাত জেগে এসেছে। ওকে ওপাশের গেস্টরুমটা দেখিয়ে দাও। হাতমুখ ধোওয়ার পর চা-জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করো। হাজার হোক, প্রণবকুমারের ভাই তো!'

লুচি বেগুনভাজা আর মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে ট্রে-র ওপর রেখে মায়াবতী পৃথাকে বললেন, 'যা দিয়ে আয়।'

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল দুই বোন। পৃথা নীতাকে বলল, 'তুই দিয়ে আয়।'

'ক্যাবলাকান্তকে দেখলেই আমার হাসি পাচ্ছে, আমি যাব না।'

'ভ্যাট! ও খুব স্মার্ট। যা।'

নীতা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রে তুলে নিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে গেল। মায়াবতী বড় মেয়েকে বললেন, 'তুই সঙ্গে যা। কী বলতে কী বলে দেবে ও।' তারপর খেয়াল হতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রণবকুমারের কীরকম ভাই হয় রে?'

'আমি জানি না।'

'তুই দেখছি কিছুই জানিস না। অত দিন ওই বাড়িতে থাকলি, যা জিজ্ঞাসা করছি তার এক উত্তর, আমি জানি না!'

'আমাকে যদি কেউ না বলে আমি জানব কী করে?' পৃথা চলে এল গেস্টরুমে। সাধারণত ওই ঘরে কেউ থাকে না। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে তাঁকে রাত কাটাতে ওই ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

পৃথা গিয়ে দেখল প্রবাল মাথা নাড়ছে, 'অসম্ভব।'

নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কত বয়স আপনার?'

'মানে?'

'কোনও মানে-টানে নয়। আমি বয়স জিজ্ঞাসা করছি।'

'একুশ।'

'একুশ বছর বয়সে আলেকজান্ডার বিশ্বজয় করেছিল আর আপনি মাত্র আটখানা লুচি খেতে পারবেন না।'

'মানে, আমার তো অভ্যেস নেই।'

'তার মানে আপনি অভ্যেসের দাস। দাস মানে হল চাকর। আপনি কি নিজেকে চাকর মনে করেন?'

পৃথা বলল, 'চাপ দিস না। যা পারে তাই খাক।'

'ওই বাড়িতে আপনি কী দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতেন?' নীতা ছাড়ছিল না।

'ভাত।'

'ভাত?' চিৎকার করে উঠল নীতা, 'অ্যাই দিদি, তুই ওখানে সাতসকালে ভাত খেতিস নাকি?'

পৃথা বলল, 'ফ্যানাভাত। আলুসেদ্ধ নয় তা অন্য কিছু সেদ্ধ। আমাকে যখন খেতে ডাকত তখন ওটা ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে যেত।'

'তা হলে থাক। এসব খেতে হবে না। সকলের পেটে তো সব কিছু হজম হয় না। মাকে বলি ফ্যানাভাত করে দিতে।' নীতা বলল।

'তুই আর একটা প্লেট নিয়ে আয়!' পৃথা বলল।

'কেন?'

'দুটো লুচি তুলে নে।'

নীতা চলে গেলে পৃথা হাসল, 'আমার বোনের স্বভাব হল সুযোগ পেলেই পেছনে লাগা। তুমি কিছু মনে কোরো না ওর মনটা কিন্তু ভাল।'

'আসলে আমাদের ওখানে লুচি খাওয়ার চল নেই।

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। পুরি, পরোটা খাওয়া হয়।'

'তুমি এত ভাল আমাদের বাংলা বলো কী করে?'

'আমার ছেলেবেলা গুয়াহাটিতে কেটেছে। আমার মা শান্তিনিকেতনের মেয়ে। মায়ের কাছেই আমি কথা বলা শিখেছিলাম।'

'ওঁরা এখন কোথায়? মানে, তোমার মা-বাবা।'

'মা ম্যালেরিয়াতে মারা গিয়েছেন। বাবা আছেন অরুণাচলে।'

প্লেট নিয়ে এল নীতা, 'কোনও জোর করা হবে না। আপনি যা খাবেন না তা প্লেটে তুলে দিন।'

চারটে লুচি আর খানিকটা বেগুনভাজা প্লেটে তুলে দিল প্রবাল। সেটা নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল নীতা।

লুচি ভেঙে মুখে পুরতেই পৃথা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কে পাঠাল? শ্বশুরমশাই না শাশুড়ি?'

পুরোটা চিবিয়ে গলায় পাঠিয়ে প্রবাল বলল, 'কর্তামশাই।'

'বাড়িতে যারা বিয়ের জন্যে এসেছিল তারা চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'পূর্ণিমাদি কেমন আছেন?'

শ্বাস বন্ধ করল প্রবাল। পূর্ণিমাদির প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন কর্তামশাই। সে শোনার ভান করল।

'কী? শুনতে পাওনি?' পৃথা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ?'

'পূর্ণিমাদি ভাল আছে তো?'

'আমাদের ওখানে ভাল ছিলেন।' তাড়াতাড়ি খেতে লাগল প্রবাল।

অবাক হল পৃথা, 'তোমাদের ওখানে ভাল ছিলেন মানে?'

খাওয়া শেষ করে প্রবাল বলল, 'একটু জল খাব।'

'দেখেছ কাণ্ড! খাবার দিয়েছে কিন্তু জল দেয়নি?' পৃথা দ্রুত চলে গেল জল আনতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রবাল। তাড়াতাড়ি মনে মনে কথা তৈরি করে নিতে লাগল। জল নিয়ে এসে পৃথা জিজ্ঞাসা করল 'তুমি চা খাও?'

ঢকঢক করে জল খেয়ে মাথা নাড়ল প্রবাল, না।

'ও। হ্যাঁ পূর্ণিমাদির কথা কী বলছিলে?' প্রসঙ্গে ফিরে এল পৃথা।

'উনি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেছেন।'

'সেকী? কেন?' অবাক হল পৃথা।

'ওঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসে অনুরোধ করলে উনি রাজি হয়ে গেলেন।'

'শ্বশুরমশাই কিছু বলেননি?'

'না। কোনও আপত্তি করেননি। বলেছেন, মেয়েদের আসল জায়গা হল তাদের স্বামীর বাড়ি। সেখানে যদি সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে তা হলে কোথাও যাওয়া উচিত নয়।'

হজম করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পৃথা জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর সেই ভাশুর এসেছিলেন?'

'কোন ভাশুর?'

পূর্ণিমা যা বলেছে তা প্রবালের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। সে বলল, 'ক'জন ভাশুর আছেন তা তো জানি না।'

'দু'জন এসেছিলেন। বেশিদূরে নয়, এই আলিপুরদুয়ারে। তোমাদের এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কুচবিহারের কাছেই তো আলিপুরদুয়ার।'

'হ্যাঁ। যাবে নাকি দেখতে?'

'কী করে যাব? আজ রাতের বাসেই ফিরে যাওয়ার হুকুম হয়েছে যে।'

বাজার থেকে ফিরে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি ফোনে খবর দিয়েছি। এক ঘণ্টা পরে আবার ফোন করব। তখন প্রাণকুমারবাবু যেন টেলিফোনের কাছে থাকেন।'

মায়াবতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ ফোন করার কী হল?'

'বাঃ। একটা বাচ্চা ছেলেকে উনি পাঠিয়েছেন আর তার সঙ্গে আমি মেয়েকে রাতের বাসে যেতে দেব? তা ছাড়া ছেলেটিকে যে উনি পাঠিয়েছেন তার তো প্রমাণ নেই। বিয়ের সময় বরযাত্রীদের দলেও তো ওকে দেখিনি।'

'পৃথা তো চেনে। বেশি বরযাত্রী আনতে চাননি বলে প্রাণকুমারবাবু

ওকে আনেননি। তাড়াতাড়ি খবর দিয়ো। যদি আজই যায় তা হলে তো আমাকে সব গুছিয়ে দিতে হবে। নীতাকে ডেকে বলো আমাকে সাহায্য করতে।' মায়াবতী বললেন।

'পৃথা কী করছে? মন তো খারাপ হবেই!'

'কোথায় মন খারাপ! দিব্যি দেওরের সঙ্গে গল্প করছে।'

'দেওর?' শব্দটা উচ্চারণ করেই মাথা নাড়লেন ডাক্তারবাবু, 'ও হ্যাঁ, তাই তো।'

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকেও একবারে লাইন পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু আজ পেলেন। যে ধরেছিল তাকে প্রাণকুমারের নাম বলতেই ডাক্তারবাবু গলা শুনতে পেলেন, 'নমস্কার বেয়াইমশাই। আপনার জরুরি তলব পেয়ে এক্সচেঞ্জে ছুটে এলাম।'

'সত্যি খুব দুঃখিত, আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু এ ছাড়া তো কথা বলার অন্য উপায় নেই। তাড়াতাড়ি কথা সারি, একটি যুবক, অল্পবয়সি, নাম বলছে প্রবাল, পৃথাকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'চিন্তার কিছু নেই। আমিই ওকে পাঠিয়েছি।'

'ও। ওইটুকু ছেলের সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সবাই আপত্তি করছে। সারা রাতের জার্নি, পথে কী হতে কী হবে, প্রবীণ মানুষ থাকলে তাঁর ওপর ভরসা করা যায়!'

'তা হলে পাঠাবেন না। এই মুহূর্তে আমার এখানে কোনও বয়স্ক বা প্রবীণ মানুষ নেই। আপনার ওখানে যদি কেউ থাকেন তাঁকে বলুন ওদের সঙ্গে আসতে।'

'আমাদের এখানে? দেখি, মালাকারদা যদি যেতে রাজি হন।'

'আপনি নিজে চলে আসুন না!'

'আমি। এখন চেম্বার বন্ধ রেখে যাওয়া খুব মুশকিল! দেখি!'

'এখনও সময় আছে। সারা দিনের মধ্যে কাউকে জোগাড় করে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ভাড়াটা না হয় আমিই দিয়ে দেব।' বলে লাইন ছেড়ে দিলেন প্রাণকুমার।

হতভম্ব হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। প্রাণকুমার ঘুরিয়ে বলে দিলেন

পৃথাকে আজ রাতের বাস ধরতেই হবে। লোক খোঁজার কারণে দেরি করা চলবে না। কিন্তু এটা কী বললেন, যাঁকে ডাক্তারবাবু ওদের সঙ্গে পাঠাবেন তাঁর বাসভাড়া উনি দিয়ে দেবেন! কী মনে করেছেন নিজেকে? এত ঔদ্ধত্য কেন? ছেলের বাবা বলে যা ইচ্ছে তাই বলার অধিকার ওঁকে কে দিয়েছে?

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, মালাকারদা তো বটেই, কোনও বয়স্ক মানুষকে ওদের গার্জেন হিসেবে তিনি পাঠাবেন না। ওরা আজই চলে যাবে যখন তখন যাক। মায়াবতীকে ব্যাপারটা জানিয়ে চেম্বারে যাওয়ার মুখে নিবারণ মালাকারের সঙ্গে দেখা। দুটো বড় চালকুমড়ো নিয়ে রিকশায় বাড়ি ফিরছেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে রিকশা থামিয়ে বললেন, 'খুব সস্তায় পেলাম বলে দুটো কিনে ফেলে ভাবছি কী করব। একটা নেবেন নাকি?'

'না না। চালকুমড়োর ভক্ত বাড়ির কেউ নয়। দাদা, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

রিকশা থেকে নেমে একটু দূরে সরে এসে নিবারণ মালাকার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে বলুন তো? আপনাকে খুব আপসেট দেখাচ্ছে!'

প্রবালের আসা, প্রাণকুমারবাবুর সঙ্গে টেলিফোনের কথাবার্তার বিবরণ দিলেন ডাক্তারবাবু। নিবারণ মালাকার বললেন, 'একটা সরল সত্য কথা শুনুন। যেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সেদিন ওর গোত্রান্তর হয়ে গেছে। শৈশব থেকে যে পদবি ব্যবহার করে এসেছিল তাও পালটে গেছে। ঠিক কিনা।'

'হ্যাঁ।'

'তত দিন সে ছিল আপনাদের মেয়ে। বিয়ের পর সে হল আর একজনের স্ত্রী, শ্বশুরশাশুড়ির বউমা, দেওর ননদের বউদিদি। অর্থাৎ তার পরিচিতি অনেক বেড়ে গেল। সে এখন ওই বাড়ির বউ। সে ওখানে কখন খাচ্ছে, কখন ঘুমোচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামালে আপনিই কষ্ট পাবেন, তার কোনও উপকার হবে না। মেয়ের বাবা হল কাকের মতো। কোকিলের ডিমকে তা দিয়ে ফুটিয়ে বড় করে। ডানায় জোর এলে সেই বাচ্চা কোকিল উড়ে যায়। এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'সবই বুঝি, তবু—।' থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু।

'আর একটা নগ্ন সত্য বলি। ও বাড়িতে গিয়ে তার ফুলশয্যা হয়েছে। দ্বিরাগমনে আপনার কাছে আসার আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ছিল। ওর শরীর মনের বদল হয়েছে এ কথা ভাবছেন না কেন? অতিরিক্ত স্নেহ করেন বলে ওকে আগলে রাখতে চাইছেন, সেটা ওর অপছন্দ হতেও পারে।' নিবারণ মালাকার উপদেশ দিয়ে রিকশায় উঠে বসলেন।

তবু মেনে নিতে পারলেন না ডাক্তারবাবু। সেই তিন-চার বছর বয়স থেকে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত মেয়ের মনটাকে যেভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি, তা এই কয়দিনে মুছে যাবে? কখনও যেতে পারে?

বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে একপ্রস্থ কান্নাকাটি হল। বাবা এবং পরে মাকে জড়িয়ে যখন পৃথা কাঁদল তখন প্রবাল কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। নীতা তার পাশে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?'

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না প্রবাল।

'ওখানে গিয়েও যদি এরকম কান্নাকাটি করে তা হলে ফেরত নিয়ে আসবেন!'

'যদি বড়রা অনুমতি দেয়—!'

'যদি না দেয়? আমার দিদি কি প্রত্যেক দিন কেঁদে যাবে? তা হলে বলবেন ওকে পুনেয় পাঠিয়ে দিতে। একা যেতে পারবে না তো, আপনি নিয়ে যাবেন।'

রিকশায় ওঠার আগে পৃথা যখন সজল চোখে বোনের কাছে এল তখন নীতা বলল, 'কেন কাঁদছিস? ছ'দিন বাদেই তো সব ভুলে যাবি। গিয়ে চিঠি লিখিস।'

বাস টার্মিনাসে পৌঁছে ডাক্তারবাবু টিকিট কাটতে যাচ্ছেন দেখে প্রবাল তাঁকে বাধা দিল, 'আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।'

'সেকী! কখন কাটলে?'

'সকালে। বাস থেকে নেমেই কেটে ফেলার আদেশ ছিল। বউদিরটা লেডিস সিটে। এই দেখুন।' টিকিট দেখাল প্রবাল।

হজম করলেন ডাক্তারবাবু। মেয়েকে লেডিস সিটের রিজার্ভড নম্বরে বসিয়ে বললেন, 'পৌঁছে চিঠি দিবি। খুব চিন্তায় থাকব। জামাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ রাখবি। আর হ্যাঁ, গ্রামাফোনের বাক্স বাসের ছাদে তুলে দিয়েছি। রেকর্ডগুলো সুটকেসে ভরে দিয়েছি। এমনভাবে প্যাক করা হয়েছে যে ভাঙবে না। যখনই মন খারাপ হবে বাজিয়ে শুনবি। তোকে তো বলেছি, আমার কোনও ঈশ্বর নেই। কোনও ধর্মগ্রন্থ নেই। আমার ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গান আমার ধর্মগ্রন্থ। মনে রাখিস, দুঃখেও তিনি, সুখেও তিনি।'

চোখ বড় করে বাবার কথাগুলো শুনেছিল মেয়ে।

এ বাড়িতে ঘর বদল হয়ে গিয়েছে পৃথার। শাশুড়ি কেটে কেটে যা বলেছেন তা বুঝতে হিমশিম খেয়েছে সে। শেষপর্যন্ত আন্দাজ করে নিয়েছে, যেহেতু তাকে একা থাকতে হবে তাই অত বড় ঘরে থাকার দরকার নেই। ভেতরের দিকে মানদাপিসির ঘরে অনেক জায়গা আছে, সেখানেই সে থাকতে পারবে। তাতে উপকারই হবে। সে এ বাড়ির ভাষা চটপট শিখতে পারবে। জিনিষপত্র যা সে রেখে গিয়েছিল এবং এবার এনেছিল তা মানদাপিসির ঘরে রাখা হল। সেখানে দুটো তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা। মানদাপিসির ঠাকুরও এই ঘরে রয়েছেন।

জীবনযাপন শুরু হল। ঘুম থেকে ভোর ভোর ওঠা, রান্নাঘরে গিয়ে ফ্যানাভাত তৈরি করা, পাশাপাশি বাড়ির বড়দের জন্যে চা বানানো, সব কাজেই তাকে হাত লাগাতে হচ্ছিল কারও না কারও সঙ্গে। সেই ভোর থেকে মাঝরাত, একফোঁটা সময় নেই নিজের জন্যে ভাবার, নিজের কাজ করার। মানদাপিসির ঘরে একটা আয়না টাঙানো আছে। একটু নড়াচড়া করলেই চেহারাটা বিকৃত হয়ে ওঠে সেখানে। তবু তারই মধ্যে নিজের মুখটা একটু একটু করে অচেনা মনে হচ্ছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে সে কয়েকটা ব্যাপারে বেশ দক্ষ হয়ে উঠল। প্রথমত, শাশুড়ির কথা বুঝতে এখন আর অসুবিধে হয় না। সে নিজে অবশ্য ওরকম টানে বলতে পারে না কিন্তু কেউ কথা বললে আর বোকার মতো তাকিয়ে থাকে না। দ্বিতীয়ত, তার খিদেবোধটা বেশ কমে গিয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম পেটে পড়ে হয় দু'হাতা

ফ্যানাভাত অথবা পাঁচ মুঠো মুড়ি আর আলুসেদ্ধ। সেটা সকাল দশটার আগে তো নয়ই। তার আগে গুষ্টির খাওয়া সযত্নে পরিবেশন করতে হয়। স্নানে যায় তিনটে নাগাদ, যখন রান্নাঘরের ধোওয়াধুয়ি শেষ। তারপর মানদাপিসিদের সঙ্গে মেঝেতে আসন পেতে খেতে বসা। প্রথম প্রথম জিভ গলা ঝালে জ্বলত, এখন জ্বলুনিটা অভ্যেসে এসে গেছে। তারপর আধঘণ্টা যেতে না যেতেই রাত্রের খাবারের আয়োজনে হাত লাগাতে হয়। তরকারি কাটতে কাটতে আঙুলে বঁটির আঘাতে রক্ত বেরুত প্রথম প্রথম, এখন আর বের হয় না। রাত্রে হেঁশেল উঠত এগারোটার কিছু পরে। তখন বুক জুড়ে অম্বল। জ্বালা করত, ঢেঁকুর উঠত। মানদাপিসি খইদুধ খেত একবাটি। কপাল ভাল এইটুকু, কৃপা করে তার থেকে খানিকটা পেত পৃথা। তৃতীয়ত, শ্বশুরমশাইকে রোজ দু'বার দেখতে যেত সে। দুপুর আর রাতের খাবারের সময়। গম্ভীর মুখে তিন রকমের তরকারির সঙ্গে দু'রকমের মাছ বা মাংস খেতেন। সে যখন পরিবেশন করছে, তখন ভুলেও মুখ তুলে তাকাতেন না তবে মাঝে মাঝে সে তাঁর গলা শুনতে পেত, 'তোমার বাবা চিঠি দিয়েছেন। ভাল আছেন ওঁরা।' সেই মুহূর্তে পরিবেশনের হাত কেঁপে উঠত, শরীর শক্ত হত। ওটা প্রথম প্রথম। পরে তাও হত না। চতুর্থত, প্রবালকে সে দেখতে পেত না। ভিতর মহলে। বাড়ির কুচো থেকে বুড়ো খেতে আসত রান্নাঘরের লাগোয়া খাওয়ার ঘরে। আর যাঁরা কাজকর্ম করে, মালি, চাকরবাকর, তাদের খাবার যেত বাইরের বারান্দায়। যেখানে চোখ যেত না ভিতর মহল থেকে। সম্ভবত প্রবাল তাদের সঙ্গেই খেতে বসত।

নতুন বউয়ের সঙ্গে ঘর ভাগ করতে হয়েছিল বলে প্রথম এক মাস মানদাপিসি উঠতে বসতে ভগবানকে গালাগালি দিতেন। এতটা কাল পুজো করেও তিনি তাঁর কোনও কৃপা পেলেন না। নিজের ঘর বলে এতটা কাল যা ভাবতেন তা আর নিজের রইল না। পৃথাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন কথাগুলো, পৃথার কিছু বলার ছিল না। শেষে এক রাত্রে বৃদ্ধার জ্বর এল। খইদুধও খেতে পারলেন না। শাশুড়ি দেখতে এসে বললেন, 'দিনে চারবার স্নান করলে শরীরে সইবে কেন? আমার হয়েছে জ্বালা।' বলে চলে গেলেন তিনি। পাশের তক্তপোশে বসে বৃদ্ধার কষ্ট দেখতে না পেরে পৃথা উঠে এসে ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ভেজা গামছা

দিয়ে কপাল মুছিয়ে দিয়েছিল বারে বারে। পায়ের তলা, হাতের চেটোয় ভেজা গামছা বুলিয়ে দিতে দিতে একসময় মনে হয়েছিল জ্বরের ঝাঁঝটা একটু কমেছে। বৃদ্ধা চোখ খুলেছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, তবু খই দিয়ে তুমি খেয়ে নাও।'

'আপনি খাবেন না?'

'না। আমার ঘুম আসছে এতক্ষণে!'

মানদাপিসি ঘুমিয়ে পড়লে সেই মধ্যরাতে এক বাটি শীতল দুধে খই মিশিয়ে খেয়ে ঢেঁকুর তুলেছিল পৃথা, তৃপ্তির।

মানদাপিসির সুস্থ হতে সময় লেগেছিল ছ'দিন। সুস্থ হওয়ার পর ঠাকুরপুজো শেষ করে বলেছিলেন, 'নাঃ, শেষপর্যন্ত দেখছি একচোখো নয়।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে ফটোতে বসে আছে। সারা জীবন এত পুজো নিল কিন্তু একটাও ভাল করেনি। কিন্তু এখন আর সেটা বলতে পারব না।'

'কেন?'

'তোমাকে তো এই ঘরে এনে দিল। কী সেবা তুমি করলে ক'দিন ধরে!'

'না না, আমি কিছুই করিনি।'

কিন্তু ব্যবহার বদলে গেল মানদাপিসির। শাশুড়ি যতই তাঁকে অপছন্দ করুক, শ্বশুরমশাইয়ের মুখের ওপর কথা বলার হক্ তাঁর আছে বলে অন্যান্যরা তাঁকে বেশ সমীহ করত। মাঝে মাঝে তাঁরই নির্দেশে একটু-আধটু ভাল খাবার জুটত পৃথার ভাগ্যে। তিন মাস চলে যাওয়ার পর মাঝরাত্রে শরীর গুলোল, পৃথা ছুটে গেল কলঘরে। নিস্তব্ধ বাড়িতে যতটা সম্ভব শব্দ বাঁচিয়ে বমি করল। মুখে হাতে জল দিয়ে সে যখন ঘরে ঢুকল তখন মানদাপিসি তক্তাপোশের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন।

'বরের চিঠি তো আসতে দেখি না?'

নিজের তক্তাপোশে বসে মাথা নেড়েছিল পৃথা।

'না লিখুক। ছেলেদের সাতখুন মাপ। তা তুমি লিখছ না কেন?'

'কী লিখব?'

'কী লিখতে হবে তা আমি বলে দেব?'

বুঝতে পারল না পৃথা। শরীরটা অস্থির লাগছিল বলে শুয়ে পড়ল।

'এর আগে বমি হয়েছে?'

'না।'

'খইদুধ খেলে কারও অম্বল হয় না যে মাঝরাতে বমির জন্যে ছুটতে হবে। কাল তোমার শাশুড়িকে বলব।'

'কী বলবেন?'

'ডাক্তার দেখাতে। এখন তো আগের দিন নেই, দশ মাস পেটে পুষে বড় করো সব কষ্ট সহ্য করে তারপর উঠোনের এক কোণে আঁতুড়ঘর তৈরি করে তাতে ঢুকে জন্ম দাও। দিতে গিয়ে কত মেয়েমানুষের প্রাণ গিয়েছে। এখন আগে থেকে ডাক্তার দেখানো, হাসপাতালের ব্যবস্থা করে রাখা যাতে সব কিছু ঠিকঠাক হয়। তা তোমার মা-বাবা কীরকম?'

কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল পৃথার। এসব কী বলছেন মানদাপিসি?

মানদাপিসি একটু থেমে বললেন, 'বাবার পক্ষে সম্ভব নয় জানি, মা তো বলে দিতে পারত। পাঁচ দিনের জন্যে সে থাকবে, এই সময়ে যাতে পেটে বাচ্চা না আসে তার জন্যে সতর্ক করেনি তোমাকে? বলে দেয়নি বরকে কী বলতে হবে?'

মাথা নেড়ে না বলেছিল পৃথা।

'বোঝো। বর তো পুনেয় ফুর্তি মারছে, এখন তুমি যদি পেটে চ্যাঙাড়ি ধরে থাকো তা হলে তার ওজন দিনকে দিন বাড়বে।'

'আপনি, আপনি এখনই কাউকে কিছু বলবেন না।' পৃথা বলল।

'কেন? বলব না কেন? তোমার বিপদ হোক আমি চাই না।'

সকাল থেকে দুপুর পার হল প্রতিদিনের মতো। কিন্তু খাওয়া শেষ হলে একজন কাজের মেয়ে এসে খবর দিল, শাশুড়ি তাঁর ঘরে যেতে বলেছেন।

এত দিন এ বাড়িতে আছে সে, ওঁর ঘরে কখনও ডাক পড়েনি। আড়ষ্ট পায়ে সে দরজায় পৌঁছে দেখল খাটে বসে শাশুড়ি পান সাজছেন। মুখ

তুলে তাকে দেখে বললেন, 'পুতুলের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে এসে দাঁড়াও।'

পৃথা ভেতরে ঢুকল। পান মুখে পুরে শাশুড়ি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এখন ওঁর কথা সে অনেকটাই বুঝতে পারে।

মুখ খুললেন শাশুড়ি, 'আর তর সইছিল না?'

মাথা নিচু করল পৃথা।

'শোনো ওসব ডাক্তারবদ্যি করার সময় তোমার শ্বশুরের নেই। আমি ঘরের মেয়েমানুষ, বাইরে বের হই না। তোমাকে কে নিয়ে যাবে ডাক্তারের কাছে? তা ছাড়া আমরাও তো মা হয়েছি, একটা নয়, তিন তিনটে বাচ্চার জন্ম দিয়েছি। কই, কখনও তো কেউ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়নি। বাড়িতেই ধাই এনে বাচ্চা বের করা হয়েছে। মানদাদিদির হঠাৎ তোমার জন্যে দরদ উথলে উঠল কেন?'

কী জবাব দেবে ভেবে পেল না পৃথা।

'মুখে তালা লাগিয়ে থাকো কেন সবসময়। কথা বলো।'

'আপনি যেমন চাইবেন তাই হবে।'

এবার মুখে হাসি ফুটল শাশুড়ির, 'আমি তোমার খারাপ নিশ্চয়ই চাইব না। হাজার হোক তুমি আমার ছেলের বউ। তোমার পেটে আমার নাতি এসেছে। এই বংশের মুখ রক্ষা করবে সে। তোমার খারাপ চাওয়া মানে তো তার খারাপ করা। কথাটা কি বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা আমি ভেবে দেখলাম তোমাকে আর মানদাদিদির সঙ্গে একঘরে রাখা ঠিক হবে না। ওই বুড়ি সবসময় তোমার কান ভারী করবে। কান ভারী হলে মন বিষিয়ে যায়। মন বিষিয়ে গেলে পেটে যে এসেছে তারও খারাপ হয়। তাই আজ থেকে তুমি আগের ঘরে গিয়ে থাকো। আমি ওই ঘরে গোপালের ছবি, শিবের ছবি, মাদুর্গার ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি। যখনই ঘরে থাকবে ওই ছবিগুলোর দিকে তাকাবে। রোজ দু'বেলা ওদের পুজো করবে। ফুলবেলপাতার দরকার নেই। মনে মনে করলেই হবে। আর তোমার শ্বশুর একটা গীতা কিনে এনে দেবেন। ওটা রোজ ঘুমানোর আগে পড়বে। এসব করলে পেটে যে এসেছে তার

মঙ্গল হবে। বুঝতে পেরেছ?' শাশুড়ি শুয়ে পড়লেন পাশ ফিরে।

আগের ঘরে আবার ফিরে এল পৃথা। তার যাবতীয় জিনিসপত্র কাজের লোকেরা পৌঁছে দিয়ে গেল। ঠাকুরদেবতাদের ছবিও টাঙিয়ে দেওয়া হল। একা হলে সে তাদের দিকে তাকাল। এই সব ছবির দিকে তাকালে পেটে যে এসেছে তার মঙ্গল হবে। পেটে হাত দিল পৃথা। পেটের ভেতর কারও অবস্থান সে টের পেল না। সে নিজে বুঝতে পারছে না অথচ মাঝরাতে বমি করেছিল বলে ওরা সব বুঝে গেল? গর্ভবতী মহিলা সে দেখেছে। বাচ্চাটা পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত শরীর ভয়ংকর খারাপ দেখায়। ভালভাবে হাঁটতে পারে না, সবসময় আঁচল টেনে সামনেটা ঢাকতে হয়। তার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই ওসব হবে। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল পৃথার। প্রণবকুমার আনন্দ কী পেয়েছিল তা সে জানে না কিন্তু লোকটা তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে।

শাশুড়ির ঘর থেকে বেরিয়ে সে মানদাপিসির ঘরে গিয়েছিল। মানদাপিসি তখন বিছানায় বসে জপ করছেন। এরকম সময়ে উনি কথা বলেন না। নিজের তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে রইল পৃথা। আধঘণ্টা বাদে প্রণাম সেরে তার দিকে তাকালেন মানদাপিসি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে মারা গেল?'

অবাক হল পৃথা, 'মানে?'

'মুখ দেখে মনে হচ্ছে কারও মরে যাওয়ার খবর পেয়েছ!'

'প্রায় সেরকমই। উনি বলেছেন, আমার নাকি এখন থেকে একা থাকা উচিত। যে ঘরে আগে ছিলাম সেই ঘরে থাকতে বললেন আর ঠাকুর দেবতার ছবির দিকে তাকাতে হবে।'

'ভাল তো। তাতে মন পবিত্র হবে।'

'আমি ও ঘরে একলা থাকব কী করে?'

'বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে সারা দিন তো একাই থাকতে!'

'একা কোথায়? মাঝে মাঝেই পূর্ণিমাদিদি আসত।'

'তুমি ওই নামটা ভুলেও উচ্চারণ করবে না।'

'কেন?'

মানদাপিসি একটা বড় শ্বাস নিলেন, 'এই কয়েক মাসে কাউকে ওই নামটা বলতে শুনেছ? এই বাড়ি থেকে ওই নাম মুছে গিয়েছে।'

'কেন? কী করেছে পূর্ণিমাদিদি? বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়া কি অন্যায়?'

'ভাল করে না জেনে উত্তর দিতে পারব না। যেটুকু জানি সেটুকুই বললাম।'

'কিন্তু আমি কী করব?'

'শাশুড়ি যা বলেছেন তাই করবে।'

'ওখানে গেলে তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না।'

'এ বাড়ির সব জায়গায় আমি যেতে পারি। ইচ্ছে হলে তোমার ঘরেও যাব। সত্যি কথা বলতে কী, এত কাল এই ঘরে একা থেকে ঠাকুরপুজো করেছিলাম। তুমি আসায় একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না তা বলব না। তুমি চলে গেলে আবার নিজের মতো থাকতে পারব।' হাসলেন মানদাপিসি, 'আমার কথা খারাপভাবে নিয়ো না। আমরা পৃথিবীতে আসি একা, যাইও একা। মাঝখানের এই থাকার সময়টায় যদি একা থাকার অভ্যেস করতে পারো তা হলে দেখবে অনেক স্বস্তি পাবে। জীবন মানেই তো কাদাপাঁকে জড়ানো নানান সম্পর্কের ডালপালা। যত জড়াতে যাবে তত নোংরা লাগবে গায়ে।'

শাশুড়ির দয়া হল। সন্ধেবেলার সংসারের কাজ থেকে তিনি তাকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু কাকভোরে উঠে হেঁশেলে যাওয়াটা চালু থাকল। বললেন, 'এই সময় যত চলাফেরা করবে তত বাচ্চার মঙ্গল। রোজ নিজের ঘর ঝাঁট দেবে, ন্যাতা দিয়ে মুছবে। খাওয়ার ঘরটাও জলখাবারের আগে মুছে রাখবে। তাতে তলপেট, পায়ের ব্যায়াম হবে। সন্ধেবেলায় ঘরে বসে গীতা পড়বে। তোমার শ্বশুরমশাই বলেছেন, মাঝে মাঝে তিনি তোমার মুখে গীতা শুনবেন।'

ফলে বিকেল চারটের সময় ভাত খেয়ে ওঠার পর বুক জ্বলতে শুরু করে। বাপেরবাড়িতে কখনও রান্নায় শুকনোলঙ্কা দেওয়া হয় না। এঁরা সেটা পছন্দ করেন। বারংবার জল খেয়েও সেই জ্বলুনি কমানো যায় না। ফলে রাত্রের খাবার একটু নাড়াচাড়া করে উঠে যায় সে। মানদাপিসি তাকে দুধ-খই খাওয়াতেন। এখন সেই সুযোগ তার নেই। খুব কান্না পায় পৃথার।

স্নান করে ঘরে এসে আয়নার দিকে তাকাতেই চোখ ছোট হয়ে গেল পৃথার। মুখের একটা দিক, গলায় ঘামাচির মতো কিছু ছেয়ে গেছে। অনেকটা এঁচোড়ের খোসার মতো দেখাচ্ছে চামড়া। খুব গরমকালেও তার কখনও ঘামাচি হয়নি। গা ঘিনঘিনিয়ে উঠল। তারপর মুখটা আয়নার কাছে নিয়ে যেতে পরিষ্কার দেখতে পেল দুই চোখের তলায় হালকা কালচে ছায়া পড়েছে। গালটা ভাঙা ভাঙা। খাটের ওপর বসে পড়ল সে। কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই, দরজা ঠেলে ঢুকলেন শাশুড়ি, 'কী ব্যাপার? শুনলাম খেতে যাওনি!'

উঠে দাঁড়াল সে। আবার প্রশ্ন এল, 'ঘুমাচ্ছিলে নাকি?'

'না।'

'তা হলে?'

'আমার মুখে গলায় কী যেন বেরিয়েছে?'

শাশুড়ি দুই পা এগিয়ে এলেন, 'কই দেখি। হাম নাকি?' খানিকটা দূরত্ব রেখেও খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'না, হাম তো নয়। ওরকম হয়। বাচ্চা হওয়ার আগে শরীরে ঘামাচি বেরুতেই পারে। তার জন্যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ঘরে বসে মুখ গোমড়া করে থাকার কোনও কারণ নেই। আমার হয়েছে জ্বালা। যাও, খেয়ে নাও।'

বাড়ির কুকুর বেড়ালেরও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে রাঁধুনিমাসি বকর বকর করতে করতে ভাতের থালা মাটিতে রেখে আসন পেতে দিলেন, 'এখন না এসে একেবারে রাতের খাওয়া খেতে এলে একটু বিশ্রাম পেতাম!'

ঠান্ডা ভাত ডাল তরকারি আর শুঁটকি। শুঁটকির গন্ধ নাকে আসতেই শরীর গুলিয়ে উঠল। কোনওরকমে বাটিটাকে দূরে সরিয়ে রেখে ভাতে ডাল মেখে দু'গ্রাস গিলে উঠে পড়ল পৃথা। দূরে দাঁড়িয়ে রাঁধুনিমাসি ব্যাপারটা দেখে চাপা গলায় বলল, 'একী! লইট্যা শুঁটকি ছুঁয়েও দেখলে না? তোমার শাশুড়ি চেটেপুটে খেয়ে গেছে।'

'আমি খেতে পারছি না। বমি বমি লাগছে।' অসহায় মুখ করে বলল পৃথা।

'দোষটা তোমার বাপের। বিয়ে দেওয়ার আগে সাতবার ভাবা উচিত

ছিল তাঁর। যাও, বাটিটা সরিয়ে রাখছি।' রাঁধুনিমাসিকে আচমকা দয়ালু দেখাল।

ঘরে ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর তার কাঁপুনি এল। শরীর গুলিয়ে উঠল। দৌড়ে পাশের কলঘরে গিয়ে বমি করল কিছুটা। খাবারের সঙ্গে তেতো জল উঠল। মুখ ধোয়ার পর একটু একটু করে শরীর শান্ত হল।

ঘরে এসে চোখে পড়ল খাটের একপাশে ছোট বই রাখা আছে। সে যখন খেতে গিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই কেউ রেখে গেছে। খুশি হয়ে বইটা তুলে নিয়ে দেখল মলাটে লেখা রয়েছে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। এই বইটা তা হলে শ্বশুরমশাই পাঠিয়েছেন। খাটে বসে সে প্রথম পাতায় চোখ রাখল, ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং, ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম। তার নীচে বাংলায় লেখা, 'হে জননী ভগবদগীতা, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যার কথা বলেছেন তা আপনি, মহর্ষি ব্যাসদেব, তাঁর। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যা গ্রন্থন করেছেন, অষ্টাদশ-অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসারনাশিনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি'।

বাবার কথা মনে এল। বাবা বলেছিল, 'গীতা কার লেখা বল তো?'

সে জবাব দেওয়ার আগেই পাশ থেকে মা বলেছিল, 'সবাই জানে। শ্রীকৃষ্ণের লেখা।'

বাবা খুব হেসেছিল। বলেছিল, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যু দেখে শোকে কাতর হয়ে অর্জুন যখন স্থির করলেন আর যুদ্ধ করবেন না তখন তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশগুলোই গীতা। মনে রাখতে হবে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে রথের ওপর বসে কাগজে কলমে লেখেননি।'

মা বললেন, 'তিনি বলেছিলেন, কেউ লিখে নিয়েছিল।'

'কে?' বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'সে সময় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না। শুনে লিখতে পারতেন গণেশ। যিনি ব্যাসদেবের মুখে শুনে মহাভারত লিখে দিয়েছিলেন। কোনও শর্টহ্যান্ড রাইটার তখন সেখানে ছিল না।'

'তা হলে কে লিখল?'

'মহাভারত কার লেখা? মহর্ষি ব্যাসদেবের। তিনি বলেছেন আর গণেশ তা শুনে লিখে গেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাভারতের একটি অংশ। মহাভারতের কাহিনির বাইরে নয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন মহর্ষি ব্যাসদেবের সৃষ্টি করা চরিত্র। তাই সেই চরিত্রগুলো যে কথা বলেছে তা ব্যাসদেব চেয়েছেন বলেই লেখা হয়েছে।'

মা খুব বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তা হলে গীতা ব্যাসদেবের লেখা?'

বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

মায়ের ঠাকুরঘরে শ্রীকৃষ্ণের ছবির নীচে গীতা বইখানা ছিল। পরদিন নীতা এসে চুপিচুপি জানিয়েছিল, 'মা ওই বইটা ঠাকুরের আসন থেকে সরিয়ে বইয়ের আলমারিতে রেখে দিয়েছে।'

কিন্তু গীতা একটি বই হলেও সেটা পড়ার আগ্রহ খুব অল্প দিনের মধ্যেই হারিয়ে গেল পৃথার। শুধু উপদেশ আর উপদেশ। যাঁরা মোক্ষপ্রদ পরম শান্তি পেতে চান তাঁদের জন্যে ওই বইটি। সে পড়েছিল, 'তুমি মদগতচিত্ত হও; আমাকে ভজন এবং পূজা করো। শান্তমনে আমাকে প্রণাম করো। তোমার মন এবং বুদ্ধি সমর্পণ করলেই তুমি আমাকে লাভ করবে।' তার এরকম কিছু করার কোনও বাসনা নেই। মানুষের জীবন এবং মনের ঘুলঘুলাইয়ার খবর জানতেই তার আগ্রহ। গীতা পড়ে রইল।

রবিবারের বিকেলে সে যখন ঘরে এসে বসেছে, কোমর টনটন করছে, তখন কাজের মেয়ে এসে জানাল শ্বশুরমশাই তাকে ডেকেছেন।

শরীর আর পারছিল না। ক'দিন আগে শাশুড়ি তাকে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে শাড়ি পরলে উঁচু হয়ে ওঠা পেটকে আড়ালে রাখা যায়। আজকাল সে উপুড় হয়ে শুতে পারে না। কেবলই হাত চলে যায় পেটের ওপর। মাঝে মাঝে শ্বাস ভারী হয়ে যায়। প্রণবকুমারের ওপর খুব রাগ হয় তখন। ওই লোকটার জন্যেই তার এই অবস্থা।

পা টেনে টেনে সে শ্বশুরমশাই-এর ঘরের দরজায় যেতেই তাঁর গলা শুনতে পেল, 'এসো বউমা। ভেতরে এসো।'

শ্বশুরমশাই-এর পাশে দু'জন যুবক বসে আছে। দু'জনকেই একরকম দেখতে।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'এরা তোমার দুই দেবর। আমার দাদা এখনও ইস্টবেঙ্গলে আছেন। আমরা যখন চলে আসি তিনি এ দুটোকে ছাড়তে চাননি। সেখানেই থেকে গিয়েছিল। এখন তো পাসপোর্ট ছাড়া আসা-যাওয়ার খুব সমস্যা তাই তোমাদের বিয়ের সময় আসতে পারেনি। বাঁদিকে যে বসে আছে তার নাম লালটু, ডান দিকে কালটু।'

সঙ্গে সঙ্গে লালটু বলে উঠল, 'বাইরের লোকের কাছে এত কথা বলার কী আছে! মা তো ঘোমটা ছাড়া চান করতেও যেত না।'

শ্বশুরমশাই হাসলেন, 'দিন বদলাচ্ছে লালটু। তা ছাড়া আমার বংশধর ওঁর শরীরে এসে গিয়েছে, এখন ওঁকে বাইরের লোক বলে ভাবি কী করে!'

কালটু বলল, 'ঠিক কথা?'

লালটু বলল, 'অ্যাই চুপ। তোকে আমি মুখ খুলতে নিষেধ করেছি না!'

পৃথা অবাক হয়ে শুনছিল। এই দুই ভাইয়ের উচ্চারণ এত দুর্বোধ্য যে সে তাল রাখতে পারছিল না। এখন এই বাড়ির মানুষদের কথা সে মোটামুটি বুঝতে পারে। কিন্তু এই দু'জন কি জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে?

শ্বশুরমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি। গীতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে?'

'মুখস্থ?' চমকে উঠল পৃথা।

'আশ্চর্য! ওইটুকু বই এত দিনেও মুখস্থ হল না? আমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলে তো গড়গড় করে পুরোটা বলে যায়। তাও বাংলায় নয়, সংস্কৃতে।'

'আমি মুখস্থ করিনি, এমনি পড়েছি।'

'তুমি এমনি পড়লে আমরা জানব কী করে?'

'ঠিক।' লালটু বলল, 'খুব স্বার্থপর দেখছি।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'আমার তো পড়ার সময় নেই। ভেবেছিলাম তুমি পড়ে মুখস্থ করলে মাঝে মাঝে তোমার মুখ থেকে শুনে নেব।'

এই সময় শাশুড়ি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালটু বলে উঠল। 'মা, মা, আমি মোগলাই পরোটা খাব। এখনই।'

শাশুড়ি বললেন, 'খাবি বাবা। প্রবালকে ডাক। এনে দেবে।'

প্রায় এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কালটু।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'তোমার বাবা চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে তুমি তাঁর ওখানে গিয়ে সন্তান প্রসব করো। আমাদের পরিবারের নিয়ম হল পুত্রবধূ স্বামীর বাড়িতেই সন্তানের জন্ম দেবে। এই বংশের উত্তরাধিকারী কেন অন্যের বাড়িতে জন্মাবে?'

লালটু বলল, 'ঠিক কথা। উনি এরকম প্রস্তাব দেন কী করে?'

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল পৃথার।

'তা হলে আমি লিখে দিই এখনই তোমার যাওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনি যা বলবেন!'

প্রবালকে নিয়ে কালটু এল, 'এসে গেছে।'

প্রবাল জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টা মোগলাই পরোটা আনব?'

লালটু বলল, 'দুটো।'

শাশুড়ি বললেন, 'না তিনটে আনিস। উনি অনেক দিন ওসব খাননি!'

পৃথা লক্ষ করছিল প্রবাল কথা বলছে তার দিকে না তাকিয়ে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যাতে দৃষ্টি না যায়। শ্বশুরমশাই শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমা খাবেন না?'

'কী যে বলো, ভাত গলা। [illegible] নামতে না নামতেই বমি করে বের করে দিচ্ছে তো মোগলাই খাবে!' শাশুড়ি বললেন।

'সেকী! আমাকে এ কথা কখনও বলোনি তো!'

'এ সময় ওরকম হয়। সব কথা ব্যাটাছেলেকে বলা যায় নাকি!'

লালটু বলল, 'বাবা, মেয়েছেলেদের ব্যাপার মেয়েছেলেদের বুঝতে দাও। এই প্রবাল, যাবি আর আসবি। আর আমারটা কড়া করে ভাজাবি।'

জ্বর এল মাঝরাতে। পৃথা জ্বরের ঘোরে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেল। তার মুখ থেকে প্রথম দিকে বাবা শব্দটি বেরিয়ে আসছিল। ভোরের দিকে নেতিয়ে পড়ল সে। বেলা আটটায় দরজা খুলছে না দেখে খবর গেল

শাশুড়ির কাছে। তিনি মানদাপিসিকে বললেন, 'গিয়ে দেখুন তো, কোনও অঘটন ঘটিয়েছে কিনা।'

মানদাপিসি এলেন। দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখলেন পৃথা চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। দু'বার ডাকলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে কপালে আঙুল রেখেই চমকে উঠলেন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। গলায় হাত দিয়ে বুঝলেন জ্বর সামান্য নয়।

বাইরে বেরিয়ে ভেতরের উঠোন পেরিয়ে মানদাপিসি শাশুড়িকে বললেন, 'কাউকে পাঠাও, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসুক।'

'কেন?' শাশুড়ির কপালে ভাঁজ।

'জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে মেয়েটা।'

ওদিক থেকে লালটু আসছিল মায়ের কাছে। শুনে বলল, 'কাল দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছিল আজ জ্বর এসে গেল। আমি দেখছি।'

মানদাপিসি বিরক্ত হলেন, 'তুই কী দেখবি?'

'বগলে রসুন চেপে রাখলেও শরীর গরম হয়।' লালটু দ্রুত চলে গেল।

মানদাপিসি চিৎকার করলেন, 'ওকে নিষেধ করো। ছি ছি ছি।'

অগত্যা শাশুড়ি উঠলেন। ততক্ষণে লালটু পৌঁছে গিয়েছে পৃথার খাটের পাশে। 'এই যে! নাটক করে লাভ নেই। ওরকম আমি অনেক করেছি। পেটপুরে খাবে কিন্তু সংসারের কাজ করবে না, তা চলবে না। দেখি, হাত তোলো, রসুনটা দাও।'

পৃথার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা তার হাত ধরে লালটু ওপরে তুলতেই শাশুড়ি ঘরে ঢুকলেন, 'অ্যাই! ছাড়, ছাড় ওকে।'

'এঃ। তুমি আবার এলে কেন?' হাত ছেড়ে দিতে সেটা প্রায় খসে পড়ল শরীরের ওপর। শাশুড়ি এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে বললেন, 'সত্যি জ্বর এসেছে। তুই যা, মোড়ের মাথায় বগলা ডাক্তারের চেম্বার। যে কেউ দেখিয়ে দেবে। তাকে বাবার কথা বলবি। বলবি বউদিদির খুব জ্বর এসেছে, ওষুধ দিতে। দিলে নিয়ে আসবি।'

'দূর! প্রাণ হাতে করে বর্ডার পেরিয়ে এলাম দু'দিন আরাম করতে। ওই ওষুধ আনাআনির মধ্যে আমি নেই।' লালটু বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন শাশুড়ি। জ্বর আসে, জ্বর চলে যায়। এরকম তা তো তিনি জীবনভর দেখলেন। ঠিক করলেন বিকেল অবধি দেখবেন, তারপর না হয় প্রবালকে পাঠাবেন?

কিন্তু ততক্ষণে মানদাপিসি পৌঁছে গেলেন প্রাণকুমারের বসার ঘরে। সেখানে তিনি কালটুর মুখে দেশের বৃত্তান্ত শুনছিলেন। দিদিকে দেখে বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে।

কোনও ভণিতা না করে মানদাপিসি বললেন, 'আমি জোর দিয়ে বলছি ওটা রসুনের গা গরম নয় তবু তোমার ছেলে লালটু গেল বউমার বগল থেকে রসুন উদ্ধার করতে। ছি ছি ছি।'

'কী হয়েছে?' সোজা হয়ে বসলেন প্রাণকুমার।

'বউমার সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পোয়াতি অবস্থায় এত জ্বর ভাল নয়। ডাক্তারকে খবর দাও।' বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি।

ছোট ছেলের দিকে তাকালেন প্রাণকুমার। বললেন, 'অপদার্থ।'

'কে বাবা?' কালটু সরল গলায় জানতে চাইল।

উত্তর না দিয়ে বাইরের দরজা দিয়ে বারান্দায় আসতেই প্রবালকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'শোন, এক্ষুনি বগলা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। আমার কথা বলবি।'

প্রবাল অবাক হল, 'কারও শরীর খারাপ?'

'যা বললাম তাই কর। অপদার্থ!'

বগলা ডাক্তার এল এম এফ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ধুতির ওপর কোট পরেন। সত্তরের ওপর বয়স। প্রবালের সঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেশার বেড়েছে?'

'আজ্ঞে না। আপনি আসুন।'

তাঁকে নিয়ে ভেতরের বারান্দায় পা দিয়ে প্রাণকুমার গলা তুললেন, 'কোথায় গেলে?' সচরাচর এরকম হয় না। ভিতর বাড়িতে বসে অবাক হলেন শাশুড়ি। শাড়ি সামলে বেরিয়ে এসে বগলা ডাক্তারকে দেখে ঘোমটা টানলেন অনেকটা।

প্রাণকুমার বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে বউমার কাছে নিয়ে যাও।'

'কে খবর দিল?' প্রশ্নটা চট করে মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'আমি।'

ঠোঁট উলটে শাশুড়ি বগলা ডাক্তারকে বললেন, 'আসুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বললেন, 'মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিল। মুখে বললেই দুটো বড়ি দিয়ে দিতে পারতেন। বউমা, জ্বর হয়েছে—।'

বগলা ডাক্তার বসার জায়গা না পেয়ে বিছানার একধারে বসে নাড়ি দেখলেন। কপালে হাত রাখলেন, 'বাঃ। জ্বর যে অস্বাভাবিক।' তারপর একটু ঝুঁকে বললেন, 'মা, মুখটা খোলো, জিভ দেখব।'

পৃথা কোনও সাড়া দিল না। বাক্স খুলে স্টেথো বের করে বুকে চেপে চেপে বোঝার চেষ্টা করলেন বগলা ডাক্তার। তারপর বললেন, 'একটু পাশ ফিরিয়ে দিন তো।'

শাশুড়ি অনেক কষ্টে পৃথাকে পাশ ফিরিয়ে দিলে পিঠ পরীক্ষা করলেন, 'কোন ডাক্তার দেখছে?'

'জ্বর তো সবে আজ এল।'

'আহা, অ্যাডভান্স স্টেজ, বাচ্চা হবে, ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো?'

'না। তেমন কাউকে দেখানো হয়নি।'

'অন্যায় করেছেন।' চোখের পাতা টেনে দেখলেন বগলা ডাক্তার। তারপর বললেন, 'প্রাণকুমারবাবুকে একটু ডাকুন।' থার্মোমিটার বের করলেন তিনি।

শাশুড়ি স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলে বগলা ডাক্তার বললেন, 'দেখুন, আমি ভাল বুঝছি না। জ্বর একশো চারের ওপর। তার ওপর ভয়ংকর রক্তহীনতায় ভুগছে। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করত না?'

'বাঃ। খাবে না কেন?' শাশুড়ি পালটা প্রশ্ন করলেন।

প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'অনেক কিছু হতে পারে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। আপনি আজই ওকে হসপিটালে ভরতি করুন। ডাক্তার দেবব্রত নাগকে আমার কথা বলবেন। খুব ভাল ডাক্তার। বাড়িতে ফেলে রাখলে—।' বগলা ডাক্তার কথা শেষ করলেন না।

প্রাণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাচ্চাটার কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

'বাড়িতে থাকলে, বলব, হবে।'

অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে পৃথাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বগলা ডাক্তার পাঠিয়েছেন শুনে ডাক্তার দেবব্রত নাগ ভরতির পর নিজে এসে পরীক্ষা করলেন পৃথাকে। তাকে স্যালাইন দেওয়া শুরু হল। একটু বাদে অক্সিজেনও। ঘণ্টাখানেক পরে প্রাণকুমারকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ছেলেরা আসেনি, প্রবাল এসেছিল সঙ্গে। প্রাণকুমারকে বসতে বলে ডাক্তার নাগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কে হন উনি?'

চেয়ারে বসে প্রাণকুমার বললেন, 'পুত্রবধূ।'

'এরকম ভয়ংকর অবস্থা কী করে হল?'

'কী অবস্থা?'

ডাক্তার নাগ একমুহূর্ত প্রাণকুমারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পুত্র এসেছে?

'না। সে পুনেয় থাকে। ফোর্সে চাকরি করে।

'ও। ওর তো বাচ্চা হতে বেশি দেরি নেই। কোনও ডাক্তার দেখিয়েছেন।'

'না। আমার স্ত্রী ওকে দেখাশোনা করছেন।'

'দেখুন, আমার উচিত আপনার বিরুদ্ধে থানায় রিপোর্ট করা। মেয়েটি যে নিয়মিত খেত না বা খাবার দেওয়া হত না তা জানা সত্ত্বেও আপনি চুপচাপ ছিলেন। ওঁর শরীরে রক্ত নেই বলা যেতে পারে। পরীক্ষার পর রিপোর্ট পাব, হিমোগ্লোবিন ছয়-এ নেমে এসেছে বলে আমার ধারণা। কনসিভ করার পর ওঁকে কোনও ডাক্তার দেখাননি। আপনারা কি চেয়েছিলেন উনি মারা যান?'

'না, তা কেন চাইব? আসলে বাড়ির অন্দরমহলের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। আমার স্ত্রী যে এতখানি ভুল করছেন আমি বুঝতে পারিনি।'

'বগলাদা পাঠিয়েছেন বলে আমি চুপচাপ থাকছি। যান, বাড়ি যান।'

'ওঁর ঠিক কী হয়েছে ডাক্তার নাগ?'

'রিপোর্ট হাতে এলে সঠিক বলতে পারব। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে টাইফয়েড।'

'সেকী!'

'আবার বিকোলাই হতে পারে। বেশ কিছু দিন এখানে চিকিৎসার জন্যে থাকতে হবে ওকে। আপনি যাওয়ার আগে অফিসে দেখা করে যান।'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে প্রবাল ডাক্তারের কথাগুলো শুনছিল, চেয়ারের শব্দ হতে দ্রুত সরে গেল থামের ওপাশে। একটু পরে প্রাণকুমারকে সে হেঁটে যেতে দেখল অফিসঘরের দিকে। তারপরে ডাক্তার নাগকে যেতে দেখল সে। খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে সে ওঁকে হলঘরে ঢুকতে দেখল। সেখানে পাশাপাশি বিছানায় রোগীরা শুয়ে আছে। পৃথার পাশে দাঁড়ানো নার্সের সঙ্গে কথা বললেন ডাক্তার নাগ। নার্স দৌড়ে চলে গেল ভেতরের ঘরে। ফিরে এল একটা ছোট ট্রে নিয়ে। তা থেকে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ তুলে অ্যাম্পুল ভেঙে ওষুধ টেনে নিয়ে পৃথার শরীরে দিয়ে দিলেন তিনি। সরে এল প্রবাল। এখন তার মনে হচ্ছিল ঘটনাটা প্রণবকুমারকে এখনই জানানো দরকার।

প্রাণকুমার দাঁড়িয়ে ছিলেন অফিসঘরের সামনে। প্রবালকে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কোথায় ঘুরে বেড়াও! এখন এখানে থেকে কোনও লাভ নেই, বিকেলে এসে খবর নিতে বলল, চলো!'

'প্রণবদাদাকে খবরটা দেবেন না?'

'খবর পেয়ে সে কী করবে? অত দূর থেকে আসতে পারবে? ছুটিই পাবে না।'

'বউদিদির যদি কিছু হয়ে যায়!'

'কিছু হয়ে যায় মানে?'

'নার্সরা বলছিল, বাঁচার চান্স খুব কম।'

'বলছিল? তারা ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানে?'

'শুনলাম তাই বললাম।'

কয়েক মিনিট হাঁটার পর প্রাণকুমার বললেন, 'বেশি কথা বলার দরকার নেই। বউমার শরীর খারাপ হয়েছে এটুকু বললেই হবে।'

'আমি বলব?'

'হ্যাঁ। তুমি বলবে। টেলিফোন নাম্বার আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

বাড়ি গিয়ে দিয়ে দেব।' কয়েক পা চুপচাপ হেঁটে বললেন, 'কথাটা বাড়ির কাউকে বলার দরকার নেই।'

বহু চেষ্টা করেও পুনেতে লাইন পেল না প্রবাল। ফিরে এসে প্রাণকুমারকে জানাতে তিনি বললেন, 'অপদার্থ, চলো আমার সঙ্গে।'

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে তিনি অনুরোধ করতেই অপারেটার বলল, 'অনেক চেষ্টা হয়েছে, লাইন লাগছে না।'

'অ। আর একবার দেখা যেতে পারে কি?'

অপারেটার চেষ্টা করামাত্র তার মুখে হাসি ফুটল, 'ফোনটা ধরুন।'

প্রাণকুমার রিসিভার তুলে নাম্বার মিলিয়ে নিয়ে ছেলের নাম, ডেজিগনেশন জানিয়ে বললেন, 'খুব জরুরি, ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' লোকটা ইংরিজিতে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললে তিনি ইশারায় প্রবালকে ডেকে বললেন, 'তুমি কথা বলো।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট আড়াই পর প্রণবকুমারের গলা শুনে প্রবাল চেঁচাল, 'দাদা, আমি প্রবাল, শিলচর থেকে বলছি?'

'হ্যাঁ। বল।'

'বউদিদি খুব অসুস্থ। হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। কোনও জ্ঞান নেই। তুমি কি এখন আসতে পারবে?'

'কবে থেকে ভরতি হয়েছে?'

'আজ সকাল থেকে।' বলামাত্র লাইন কেটে গেল। অপারেটার রিসিভার নিয়ে কয়েক বার হ্যালো বলে রি-ডায়াল করে বলল, 'পাওয়া যাচ্ছে না।'

বিল মিটিয়ে দিয়ে প্রাণকুমার ঘড়ি দেখলেন, 'আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।'

'লাইনটা কেটে যাওয়ায় সব কথা বলা হল না।'

'যা বলার তা তো বলেই দিয়েছ আর যেভাবে চেঁচিয়েছ তাতে শিলচরের কারও শুনতে বাকি নেই অপদার্থ।'

'বউদিদির বাবা-মাকে খবরটা দেবেন না?'

'সময় হলেই দেব।' একা রিকশা দাঁড় করিয়ে প্রাণকুমার চলে গেলেন।

ঠিক তখনই এক্সচেঞ্জ থেকে একজন বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে আপনি পুনায় ফোন করেছিলেন না? আপনার ফোন এসেছে।' দৌড়াল প্রবাল।

অপারেটার রিসিভারটাকে দেখিয়ে দিতে প্রবাল সেটা কানে চেপে চেঁচাল, 'হ্যালো!'

'অত চেঁচাচ্ছিস কেন?' প্রণবকুমারের গলা, 'বউদির কী হয়েছে?'

'অনেক কিছু। শরীরে রক্ত নেই। খুব জ্বর। বেহুঁশ। বাচ্চা হবে তো, এখন যদি টাইফয়েড হয় তা হলে খুব মুশকিল।' গুছিয়ে বলতে পারছিল না প্রবাল।

'ওর বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?'

'না।'

'আমাকে খবরটা দিতে তোকে কে বলল?'

'কর্তাবাবু। তিনি বলেছেন বাড়িতে না জানাতে।' বলেই কৌতূহলী হল প্রবাল, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'কী?'

'তুমি কি আসতে পারবে?'

'দেখি, ছুটি পাব কিনা তা জানি না। আর আমি তো ডাক্তার নই। গিয়েই বা কী কাজে লাগব!' শেষের কথা প্রণবকুমার নিচু গলায় বলল।

'আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'তাড়াতাড়ি বল!'

'ইয়ে, মানে, পূর্ণিমাদিদি কেমন আছে? তোমার কাছে আছে তো?'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে প্রণবকুমার বলল, 'এখন সে তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। কিন্তু কথাটা কাউকে বলার দরকার নেই। রাখলাম!'

তাজ্জব হয়ে গেল প্রবাল। পূর্ণিমাদিদির জন্যে এ বাড়িতে এত অশান্তি হল, সবাই জানল সে পুনেয় প্রণবকুমারের সঙ্গে আছে অথচ তার পরের খবরটা কেউ রাখল না। পূর্ণিমাদিদির শ্বশুর বাড়ি মানে আলিপুরদুয়ার। প্রবালের মনে হল কর্তামশাইকে খবরটা জানানো দরকার। উনি চলে যাওয়ার পর প্রণবকুমার ফোন করে খবর নিয়েছেন এটা শুনলে উনি খুশি হবেন। সে হাসপাতালের পথে হাঁটতে লাগল।

পৃথার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার দেবব্রত নাথ জানালেন অসুখটা টাইফয়েডই। জ্বর কমবার পরেও বহু দিন ওঁর দুর্বলতা থাকবে। এখন যা শরীরের অবস্থা, আরও দিন তিনেক না কাটলে স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রাণকুমারকে নার্স বলল, 'আপনাদের বাড়িতে কোনও মহিলা নেই?'

'আছে। কেন?'

'আশ্চর্য। পেশেন্টকে এক বস্ত্রে এনে ভরতি করিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁরা একবারও ভাবলেন না ওই এক শাড়ি জামায় সে কতক্ষণ থাকবে। ওর চিরুনি, টুকটাক প্রয়োজনীয় জিনিসও আপনারা দিয়ে গেলেন না। ফলটলের কথা ছাড়ুন, এখন ওসব খাওয়ার ক্ষমতা ওর নেই কিন্তু মিনিমাম প্রয়োজনের দিকটা দেখবেন তো!'

নার্স বিরক্ত হয়ে চলে গেলে প্রাণকুমার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার এখনও আসেননি। তাঁর মনে হল নার্স কোনও মন্দ কথা বলেনি। ওগুলো বাড়ি থেকেই দেওয়া উচিত ছিল। এই সময় প্রবালকে দেখতে পেলেন। কাছে এলে বললেন, 'সোজা বাড়ি চলে যাও। রিকশায় যাবে আসবে। বউমার শাড়ি-জামা চিরুনি, যা যা লাগে তা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে এসো।'

মাথা নাড়ল প্রবাল, 'দাদা আবার ফোন করেছিল। বললেন, পূর্ণিমাদিদি শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে।'

প্রাণকুমার চমকে তাকালেন প্রবালের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জিজ্ঞাসা করলে না সে নিজের থেকে বলল?'

তখনই খেয়াল হল প্রবালের। প্রণবকুমার তাকে নিষেধ করেছিল কাউকে কথাটা না বলতে। সে উত্তেজনায় বলে ফেলেছে। অতএব এখন তাকে মিথ্যে বললে হল, 'আমি কেন জিজ্ঞাসা করব? বউদিদির কথা বলতেই উনি বললেন।

'খবরদার, এই কথা যদি বাড়ির কেউ জানে তা হলে তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

'কেউ জানবে না।' প্রবাল দ্রুত রিকশার সন্ধানে চলে গেল।

হাসপাতাল চত্বরে একটা বেঞ্চ দেখে সেখানে বসলেন প্রাণকুমার। যেদিন

পৃথাকে নিয়ে প্রণবকুমার দ্বিরাগমনে গেল সেদিনও কেউ বুঝতে পারেনি যে কয়েক ঘণ্টা পরে পূর্ণিমাকে পাওয়া যাবে না। বিধবা এই আত্মীয়াটিকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। শ্বশুরবাড়িতে সে বিধবা অবস্থায় নিরাপদ নয় বুঝেই ওকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মানদা তাঁকে বলতেন বিয়ের আগে থেকেই নাকি পূর্ণিমা প্রণবকুমারের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় এ সব নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। তারপর প্রণবকুমার ফোর্সে চাকরি পেয়ে চলে যেতে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা বিধবা হয়ে আসার পর প্রণবকুমার এই ছুটিতেই তাকে অনেক দিন বাদে দেখল। অতএব অতীতে যদি মন দেওয়া-নেওয়া করেও থাকে তা পৃথাকে বিয়ের পর ধামাচাপা পড়ে যাওয়ার কথা। পূর্ণিমা যে ওর কাছে চলে গিয়েছে এই খবরটা প্রণবকুমারই দিয়েছিল। বাবাকে নয়, মাকে চিঠি লিখেছিল সে, 'পূর্ণিমাকে নিয়ে তোমরা চিন্তা কোরো না। সে আমার এখানে চলে এসেছে।' তার উত্তরে ওর মা নয়, তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বাড়িতে তোমাদের আর কখনও আসার দরকার নেই।' এরপর প্রণবকুমার কোনও চিঠি লেখেনি।

সেই ছেলে আজ প্রবালকে জানিয়েছে যে পূর্ণিমা তার শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে লোকজন তাকে গ্রহণ করল? এখনও তিনি ভেবে পান না ওই মেয়ে শিলচরে থেকে পুনেয় গেল কী করে? আর আলিপুরদুয়ারে নিশ্চয়ই প্রণবকুমার তাকে পৌঁছে দিয়ে আসেনি। সে একাই চলে এসেছে। অন্তত দু'বার ট্রেন বদলাতে হয়েছে তাকে। যাওয়ার সময় এখান থেকে বাসে যেতে হয়েছে। বাস বদল করে কুচবিহারে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায়। কলকাতা থেকে বোম্বাইতে গিয়ে আবার ট্রেন বদলে পুনে। ধরে নেওয়া যেতে পারে ওর কাছে যা টাকা ছিল তাতে ট্রেনের টিকিট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অচেনা পথে, একা মেয়ের যেতে সাহস হবে না যদি প্রণবকুমার পেছনে না থাকে। তাঁর মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয় পৃথাকে বাপের বাড়িতে রেখে প্রণবকুমার কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে পুনে গিয়েছিল। খবরটা নিশ্চয়ই পৃথা বা তার বাবা জানে না। জানলে তার প্রতিক্রিয়া হতই। এখন কথা হল, পূর্ণিমা প্রণবকুমারের কাছ থেকে চলে এল কেন? আর চলে

এলে তার মাথা গোঁজার জায়গা ছিল দুটো। শিলচরের বাড়ির দরজা তার জন্যে বন্ধ সে কথা সে জানত। তাঁর লেখা চিঠি নিশ্চয়ই সে দেখেছে। অতএব আলিপুরদুয়ারে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু কী এমন সমস্যা হল যে ওরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারল না? প্রাণকুমার ভেবে পাচ্ছিলেন না।

দু'দুটো রিকশা একসঙ্গে হাসপাতাল চত্বরে ঢুকছে দেখে ভাল করে তাকালেন প্রাণকুমার। একটায় বসে আছে প্রবাল, হাতে চটের থলি। দ্বিতীয়টায় তাঁর স্ত্রী এবং মানদা। দু'জনের ঊর্ধ্বাঙ্গে এই গরমেও সুতির চাদর জড়ানো।

প্রাণকুমার এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা?'

মানদা রিকশা থেকে নেমে বললেন, 'বউমাকে দেখতে এলাম।'

'এখন দেখার কিছু নেই, শরীরে নল জড়িয়ে শুয়ে আছে।' প্রাণকুমার কথাটা বলতেই তাঁর স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কী এমন হয়েছে যে নল জড়িয়ে শুতে হবে! আমাদেরও তো কত অসুখবিসুখ হয়েছে। কখনও হাসপাতালে কেউ নিয়ে যায়নি আর নিয়ে গিয়ে সারা দিন এখানে হন্যে হয়ে বসে থাকেনি। যে শুনবে সেই বলবে শ্বশুর বউমার জন্যে কত চিন্তিত অথচ বাড়ির মেয়েদের কোনও হুঁশ নেই। চল প্রবাল।'

পৃথাকে দেখে মানদাপিসি খুব চিন্তায় পড়লেন। নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁগো মেয়ে, ভাল হয়ে যাবে তো!'

'হবে। তবে সময় লাগবে।'

'পেটের বাচ্চাটা?'

'ওটার জন্যেই তো যত চিন্তা। জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন?'

প্রবাল সেগুলো নার্সের হাতে তুলে দিলে নার্স বলল, 'দিন-রাতের জন্যে আয়া রাখতে হবে। অফিসে গিয়ে বলুন।'

প্রাণকুমারের স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আয়া কেন?'

'চব্বিশ ঘণ্টা তো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। অন্যান্য পেশেন্ট আছে। অন্য কাজও আছে। তা ছাড়া ওর মলমূত্র পরিষ্কার করার কাজ আমাদের নয়।' নার্স চলে যেতেই প্রাণকুমারের স্ত্রী বললেন, 'কীরকম দেমাক দেখলেন! শুধু যেনতেন উপায়ে টাকা খরচ করাবার মতলব।'

বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ানো প্রাণকুমারকে মানদা বললেন, 'দেখে একটুও ভাল লাগল না। ওর বাবাকে খবর পাঠানো হয়েছে?'

প্রাণকুমারের স্ত্রী বললেন, 'তিনি খবর পেয়ে এসে মেয়েকে সারিয়ে দিতে পারবেন? আমি ভাবছি অন্য কথা!'

'কী? প্রাণকুমার জানতে চাইলেন।

'শুনেছি টাইফয়েড হলে মাথায় টাক পড়ে যায়। বউমার যদি টাক পড়ে তা হলে পেটেরটারও তো টাক পড়বে।

'পড়লে পড়বে।' প্রাণকুমার বললেন, 'তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।'

তাঁর স্ত্রী মুখ বেঁকালেন। 'এত দিন পরে বাড়ি থেকে বের হলাম, রিকশায় একটু ঘুরে কালীবাড়িতে আরতি না দেখে কেন ফিরব?'

ওঁরা চলে যাওয়ার পর ডাক্তারের দেখা পেলেন প্রাণকুমার। ডাক্তার বললেন, 'খুব স্লো উন্নতি হচ্ছে।'

'যাক।' একটু স্বস্তি পেলেন প্রাণকুমার।

প্রবাল পেছনে ছিল। নার্স যে আয়ার কথা বলেছিল তা মনে করিয়ে দিল। প্রাণকুমার বললেন, 'আমাকে না জানালে আমি জানব কী করে?'

সেই ব্যবস্থা অফিসকে বলে করলেন প্রাণকুমার। তারপর প্রবালকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে রিকশা নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এলেন। এসে শুনলেন আজ সব লাইন ডাউন হয়ে গেছে। কোথাও ফোন করা যাবে না। ভাবলেন এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে তিনি আজ রাত্রে চান না। কাল দেখা যাবে।

পৃথার চেতনা ফিরে এল। কথাও বলতে পারল। ডাক্তার নাগ একজন গাইনিকে কল দিয়ে তাকে পরীক্ষা করালেন। তিনি দুটো ওষুধ প্রেসক্রাইব করলেন। জানালেন, সুস্থ হয়ে গেলেও পেশেন্টকে চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে। হাঁটাচলা করলে শিশুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ডাক্তার নাগ প্রাণকুমারকে ব্যাপারটা জানাতে চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। পৃথাকে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে রাখলে দু'বেলা আয়া রাখতে হবে। এখানটায় তীব্র আপত্তি জানাবেন তাঁর স্ত্রী। প্রথমত, প্রণবকুমার টাকা পাঠানো দূরের কথা, এবার গিয়ে একটা চিঠির

পরে আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি। দ্বিতীয়ত, আয়ারা সাধারণত উঁচু শ্রেণির পরিবার থেকে আসে না। তাদের রোজ তোয়াজ করার বাসনা তাঁর হবে না। এই খবরের কথা প্রাণকুমার না ভাবলেও ভদ্রমহিলা ভাববেন। বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে রাখলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার নাগ চাইছেন না আপাতত সুস্থ কোনও মানুষের জন্যে একটা বেড আটকে থাকুক। শিলচর শহরে কোনও নার্সিংহোম তখনও হয়নি। সেক্ষেত্রে গুয়াহাটিতে পৃথাকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ধকল পৃথা নিতে পারবে কি না সেই সন্দেহ ডাক্তার নাগেরও আছে। পৃথা এখন বিছানায় উঠে বসতে পারছে। আয়ার হাত ধরে টয়লেটেও যাচ্ছে। শরীর থেকে নলগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তার শরীরের নিম্নভাগ বেশি স্ফীত দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড দুর্বল সে।

প্রাণকুমার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। পৃথার শারীরিক সংকট কেটে গেলে তিনি ওর বাবাকে ফোন করেছিলেন। বলেছেন, বউমা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু এখন ভাল আছে। ডাক্তারবাবু জানতে চেয়েছিলেন, কী হয়েছিল? প্রাণকুমার জবাব দিয়েছিলেন, এমন কিছু নয়, সামান্য জ্বর।

আজ তাঁর মনে হল, সমস্যার সমাধান ভালভাবে হতে পারে যদি তিনি পৃথাকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। গুয়াহাটিতে নিয়ে গিয়ে নার্সিংহোমে রাখার খরচও বেঁচে যাবে আবার সে বাবা ডাক্তার হওয়ায় কিছুটা নিরাপদে থাকতে পারবে। কিন্তু এত দূরের এই বাসযাত্রার ধকল সে সামলাতে পারবে কিনা তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

বাইরের ঘরের দরজায় চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। কিছু বলার আগেই প্রণবকুমার এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

প্রাণকুমার গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার চিঠি পড়োনি?'

'পড়েছি। আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছেন।' প্রণবকুমার বলল।'

'ভুল?' ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটল প্রাণকুমারের মুখে, 'সেটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই হত!'

'তাতেও আপনাদের ভুল ভাঙত না।'

'আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। যতই চেপে রাখার চেষ্টা হোক, বদ রক্ত শরীর থেকে বের হবেই। এ বাড়িতে আসার সাহস হল কোত্থেকে।'

'আপনি আমাকে বলতে দেবেন?'

'কী বলবে তুমি?' প্রাণকুমার ভেতরের দরজার দিকে তাকালেন। কপাল ভাল বর্ডার পেরিয়ে আসা দুই ছেলে এখন গুয়াহাটিতে বেড়াতে গিয়েছে।

'পূর্ণিমা কোনও খবর না জানিয়ে আমার ওখানে চলে গিয়েছিল। তার মতো বাইরে না বের হওয়া মেয়ে যে কীভাবে যেতে পারল তা আমাকে অবাক করেছিল।'

'আমি শুনতে চাই না।'

'শুনতে হবেই।'

'কেন শুনব? সদ্য বিয়ে করে বিধবা বোনকে নিয়ে ওখানে থেকেছ আর আমাকে তার গল্প শুনতে হবে?'

'পুরোটা শোনার পর আপনি যা বলার বলবেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি কেন সে এসেছে? সে পরিষ্কার বলেছিল, বৈধব্য জীবন সে আর সহ্য করতে পারছে না। এ-বাড়িতে মা ওর ওপর খুব অত্যাচার করছে। সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায়। ভেবেছিলাম, দু'দিন বাদে আপনাকে সব জানিয়ে ওকে ফেরত পাঠাব। কিন্তু তার মধ্যেই সে মাছ-মাংস রান্না করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। বিয়ের পর যে রঙিন শাড়ি পরত তার কয়েকটা নিয়ে গিয়েছিল। সেগুলো পরতে লাগল। দেখে মনে হত এত আনন্দে সে কখনও থাকেনি।' একটু থামল প্রণবকুমার। তারপর বলল, 'আমার কোয়ার্টার্সে দুটো শোওয়ার ঘর। তার একটায় থাকত সে। দু'বেলা ভাল মন্দ রান্না করত। আমার খাওয়ার সমস্যা থাকল না। তখন মনে হল ওকে জোর করে এখানে পাঠালে ওর জীবন আবার অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ওর মনের ওপর ভয়ংকর চাপ পড়বে। তাই ওর ওখানে যাওয়ার খবরটা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি সেটা মেনে নিতে পারেননি।'

'কোনও সুস্থ মানুষ পারে না। বিধবা বোন মাছ মাংস খেয়ে রঙিন শাড়ি

পরে যদি আনন্দ পায় তা হলে আমি যখন আবার বিয়ের কথা বলেছিলাম তখন রাজি হল না কেন?'

'ভুল করেছিল। পরে সেটা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি।'

'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। তুমি ওকে লোভ দেখিয়েছিলে।'

'বাঃ। চমৎকার। আপনি কি জানেন ও তিন-চার মাস আগে আমার ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

'শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'কেন?'

'ও কোথায় আছে এখন?'

'আলিপুরদুয়ার। ওর শ্বশুরবাড়িতে।'

'এত নোংরামি করার পর ওর ভাশুর, ওর জা ওকে ঘরে নেবে?'

'তাদের বোধহয় নোংরামি বলে মনে হয়নি। আপনি খোঁজ নিন।'

'নেব। তা হঠাৎ তাকে চলে যেতে বাধ্য করলে কেন?'

'ওর মনে আমার সম্পর্কে দুর্বলতা বাড়ছিল। রাত্রে নিজের ঘরে যেতে চাইত না। বাকিটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি তাকে অনেক বলেছি, ও আমার সম্পর্কিত বোন, আমি বিবাহিত, আমাদের মধ্যে ওসব হতে পারে না কিন্তু দেখলাম ও ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। উপায় ছিল না, আমাকে রুক্ষ হতে হল। জোর করে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলাম টিকিট করে।'

'এই সব গল্প যদি তুমি বাড়ির ভেতরে গিয়ে করো তা হলে কি মনে করছ ওরা বিশ্বাস করবে? তোমার স্ত্রী এখানে পড়ে রইল, একটা টাকা দূরের কথা, একটা চিঠি তাকে লিখেছ? ক'দিন দেখেছিল সে তোমাকে? সাত দিন? সাত দিনের কথা সে সারা জীবন মনে রাখবে?' খিঁচিয়ে উঠলেন প্রাণকুমার।

'আমি তাকে পুনেয় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—!'

'যদি জানতাম তুমি বিধবা বোনকে নিয়ে যাবে তা হলে বউমাকেই পাঠাতাম। যাক, কী মনে করে এসেছ।'

'আপনার বউমা এখন কেমন আছে?'

'তাঁর খোঁজ নেওয়ার কোনও দরকার নেই। সেই অধিকার তুমি হারিয়েছ।'

'সে কি এই বাড়িতে আছে?'

'জেনে কী করবে? তোমার মা তোমাকে দেখা করতে দেবেন?'

'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারব না?'

'না।'

'বেশ। সে যদি দেখা করতে না চায় তা হলে আমি মেনে নেব।'

'ঠিক আছে, আমি তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তোমাকে জানাব।' প্রাণকুমারের কথা শেষ হওয়ামাত্র তাঁর স্ত্রী এবং মানদাপিসি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মানদাপিসি বললেন, 'অমন লক্ষ্মীর মতো বউকে এখানে ফেলে রেখে তুই বিধবা বোনের সঙ্গে ঘর করছিস? তোর কি লজ্জাও হয় না?'

প্রাণকুমারের স্ত্রী বললেন, 'ও কি ওই বিধবাটাকে সঙ্গে এনেছে? যদি তাকে নিয়ে এ বাড়িতে ঢোকে তা হলে গলায় দড়ি দেব।'

মানদাপিসি বললেন, 'তুমি নিজের গলায় দড়ি দেবে কোন দুঃখে? তাকে বিষ খেতে বলো। ছি ছি ছি।'

প্রাণকুমারের স্ত্রী বললেন, 'গতবারেই সন্দেহ হয়েছিল। এত হাসাহাসি, ছুটিতে এলেই তার চেহারা বদলে যাওয়ার পেছনে কারণ আছে। দিদি বলত কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। ভাবলাম বিয়ে দিলে মাথা থেকে পেতনি নামবে। ওমা! তাকে যে পেছন পেছন নিয়ে যাওয়ার কৌশল করা হয়েছে তা এক বিন্দু টের পাইনি।'

প্রাণকুমার ধমক দিলেন, 'আর চেঁচিয়ো না। পাড়ার লোকজন এখনও জানে না, জানলে টেকা যাবে না। শোনো, তুমি হোটেলে উঠলে আমি স্বস্তি পেতাম। কিন্তু তাতেও লোকলজ্জা বাড়বে। তুমি আজকের দিনটা এই বার-বাড়িতেই থাকো। এখানেই স্নান খাওয়া করবে। ভুলেও ভেতরে যাবে না।' তারপর মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও তোমরা।'

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাইরের বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিল প্রণবকুমার। প্রবাল এল হাসপাতাল থেকে। প্রণবকুমারকে দেখে সে

অবাক। কাছে এসে বলল, 'আরে! কখন এলে?'

গম্ভীর গলায় প্রণবকুমার বলল, 'সকালে।'

'বউদিদি এখন অনেক ভাল। আজ ভাত খেয়েছে অনেকটা। আমার সঙ্গে গল্প করল। প্রবাল বলল।

'তোর সঙ্গে কখন কথা হল?'

'একটু আগে। আমি তো হাসপাতাল থেকে আসছি।'

'হাসপাতাল?' অবাক হল প্রণবকুমার, 'সে এখনও হাসপাতালে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। টাইফয়েড হয়েছিল তো। খুব দুর্বল। তারপর ডাক্তার বলেছে নড়াচড়া করলে পেটের বাচ্চার ক্ষতি হবে।' বলে প্রবাল ভেতরে চলে গেল।

প্রণবকুমার মাথা নাড়ল। প্রাণকুমার তাকে জানতে দেননি যে পৃথা এখনও হাসপাতালে রয়েছে। এমনভাবে বলেছেন সে এ বাড়িতেই আছে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি তাকে পৃথার কাছে যেতে দিতে চান না। সে ঠিক করল পৃথা কোথায় আছে তা সে জেনেও না জানার ভান করবে। প্রাণকুমার নিশ্চয়ই বিকেলে গিয়ে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করবেন সে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চায় কি না। প্রশ্নটা করার কারণ একটাই, পৃথাকেও বলা হয়েছে পূর্ণিমার পুনেয় গিয়ে থাকার ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই নানান রং চড়িয়ে বলা হয়েছে। তাই এখন যদি পৃথা জানায় তার দেখা করার কোনও ইচ্ছে নেই তা হলে আর এখানে না থেকে আজ রাত্রের বাসে চলে যাবে সে। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে।

স্নান-খাওয়া বাড়ির বাইরের ঘরেই করতে হল। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ছিল। তক্তাপোশে শুয়ে পড়ল প্রণবকুমার। ঘুম ভাঙাল প্রবাল। বলল, 'কর্তাবাবু হুকুম দিয়েছেন তোমাকে যেন কোনও কথা না বলি।'

'তুই বলিসনি তো হাসপাতালে ওর থাকার কথা বলে দিয়েছিস?'

'মাথা খারাপ! আমি এখন অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলি। যাই।'

সন্ধে সাড়ে সাতটায় ফিরে এলেন প্রাণকুমার। তখনও শুয়ে ছিল প্রণবকুমার। তাঁকে দেখে উঠে বসল সে।

প্রাণকুমার বললেন, 'ডাক্তারকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, বউমার এমন কথা শোনা উচিত নয় যা তাঁকে মানসিক আঘাত দেবে।'

'ও।'

'এখন তুমি কী করবে?'

'তা হলে আজ রাত্রেই ফিরে যাব।'

'সেটাই ভাল। আমি আলিপুরদুয়ারে খোঁজখবর নিই। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় তা হলে মনে করব তোমার কোনও দোষ নেই। বউমাকেও বুঝিয়ে বলব। এই সময় ওর শরীরে বা মনে কোনও আঘাত লাগলে বিপদ হতে পারে। সব কিছু ঠিক থাকলে আমি তোমাকে জানাব, তখন এ বাড়িতে এসো।

এগিয়ে গিয়ে সুটকেস খুলল প্রণবকুমার, 'ওর জন্যে আপনার অনেক খরচ হচ্ছে, হাজার দেড়েক দিয়ে যাচ্ছি।'

টাকাটা বের করে টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে সুটকেস বন্ধ করল প্রণবকুমার, 'মা-পিসিকে বলে দেবেন। যাচ্ছি।'

বাইরে বেরিয়ে রিকশা নিল সে। হাসপাতালের পথেই প্রবালের দেখা পেয়ে রিকশা থামাল, 'উঠে বস।'

'কোথায় যাব?'

'যেখান থেকে এসেছিস।'

'কর্তাবাবু বাড়িতে ঢুকে গেছেন?'

হ্যাঁ। তোর ভয় নেই।'

ভিজিটার্সদের কয়েকজন তখনও হাসপাতাল ছাড়েননি। প্রবাল প্রণবকুমারকে নিয়ে গেল পৃথার বিছানার কাছে। পৃথা টুলের ওপর পা রেখে বিছানায় শুয়ে ছিল। প্রথমে প্রবালকে দেখতে পেল সে, তারপরে প্রণবকুমার। প্রথমে মনে হয়েছিল খুব চেনা কোনও মানুষ। তারপরই বুঝতে পেরে অসহায়বোধ করতে লাগল। এই লোকটা, যে তার স্বামী, তার এমন শারীরিক অবস্থার জন্যে যে দায়ী, সে আবার ফিরে এসেছে! কিন্তু সে শুনেছিল লোকটা এক বছরের মধ্যে ফিরবে না।

'কেমন আছ?' প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'ভাল।'

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? শরীর তো অর্ধেক হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া করতে না?'

পৃথা জবাব দেওয়ার আগেই পাশ থেকে প্রবাল বলল, 'না বললেই ঠিক জবাব হয়!'

'কেন?' প্রবালের দিকে তাকাল প্রণবকুমার।

'যা দিত তা খেতে পারত না।'

'তুই কী করছিলি? বাইরে থেকে এনে দিসনি কেন?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমার অত পয়সা কোথায়?'

'তুই গিয়ে দ্যাখ তো, ডাক্তার আছে কিনা!'

এই সময় নার্স এসে বলল, 'সময় শেষ হয়ে গেছে, এবার আপনারা চলে যান।'

প্রবাল বলল, 'দিদি, বউদির শরীর খারাপের খবর পেয়ে দাদা আজই পুনে থেকে এসেছেন। একটু থাকতে দিন!'

'ও। আপনি ওর হাজব্যান্ড?'

মাথা নাড়ল প্রণবকুমার।

'আপনি তো আচ্ছা লোক, বউকে এখানে মেরে ফেলার জন্যে রেখে গেছেন? যাক গে, পাঁচ মিনিট পরে চলে যাবেন।' নার্স চলে যেতেই প্রবাল ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে।

প্রণবকুমার দেখল পৃথা মুখ নিচু করে বসে আছে। ওর স্ফীত পেটের দিকে নজর গেল। তার সন্তান ওখানে আছে!

সে বলল, 'জানি তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছ। হয়তো ক্ষমা করতে পারবে না কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নির্দোষ। বাবা মা আমাকে ওই বাড়িতে থাকতে দিতে চাইছেন না। তাই আমি আজই ফিরে যাব।'

'আমিও যাব।' মুখ তুলে কাতর গলায় বলল পৃথা।

'তুমি কোথায় যাবে? এই অবস্থায় তোমার তো নড়াচড়া করা উচিত নয়।'

'আমি পারব!'

'ওসবের পরেও তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল পৃথা।

'ঠিক আছে, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি।' প্রণবকুমার দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। পূর্ণিমার পুনেয় গিয়ে থাকার ঘটনাটা জেনেও পৃথা তার সঙ্গে যেতে চাইছে? সে কী করবে? শিলচর থেকে পুনেয় ওকে কোনও অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ওর গলা শোনার পর ওকে এখানে আর রেখে যেতে মন চাইছে না। চেহারা দেখে বোঝাই যায় পৃথা এখানে একটুও আরামে ছিল না। হঠাৎ তার মনে হল, পৃথাকে যদি কোনওরকমে ওর বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। তা হলে সেবাযত্নের অভাব হবে না। কিন্তু কী করে নিয়ে যাবে?

ডাক্তার প্রণবকুমারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'আপনি তো পুনেয় থাকেন। অত দূর থেকে এখন এখানে আসার কী দরকার ছিল?'

প্রণবকুমার বুঝতে না পেরে বলল, 'এ কী বলছেন। স্ত্রী অসুস্থ শুনেও আসব না?'

'বাঃ। যাঁকে স্ত্রী বলে ভাবছেন তাঁকে তিলতিল করে আপনার বাবা মা মেরে ফেলছেন জেনেও তো হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। বেচারার কপালে হয়তো আরও দুর্ভোগ লেখা আছে তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেল। ওঁকে কোথায় রাখবেন?'

'মানে?'

'এখন দুর্বলতা ছাড়া ওঁর কোনও অসুখ নেই। কিন্তু বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত একদম হাঁটাহাঁটি করা চলবে না। যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে শুয়ে থাকতে। আপনার বাবা বললেন, আপনাদের বাড়িতে সেটা সম্ভব নয়। আপনার মা নাকি আয়াদের ঢুকতে দেবেন না। আমার এখানে ওঁকে বেশি দিন রাখা সম্ভব নয়। পেশেন্ট এলেই ওঁকে বেড খালি করে দিতে হবে। আপনি যখন এসে গেছেন তখন ব্যবস্থা করুন।'

একটু ইতস্তত করে প্রণবকুমার ইচ্ছেটা ডাক্তার নাগকে জানাল। পৃথাকে ওর বাপের বাড়িতে সে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাসে যেতে হবে আর সময় লাগবে অনেক। অতক্ষণ কি পৃথার পক্ষে বসে যাওয়া সম্ভব হবে?

মাথা নাড়লেন ডাক্তার নাগ। 'আমি কখনই হ্যাঁ বলতে পারি না। কিন্তু

আপনি যদি ঝুঁকি নিতে চান তো নিতে পারেন।' একটু ভাবলেন তিনি, 'যদি শুইয়ে নিয়ে যেতে পারেন আর ড্রাইভার যদি ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে চালাতে পারে তা হলে চান্স নিতে পারেন।'

'তা হলে অ্যাম্বুল্যান্স জাতীয় গাড়ি বা প্রাইভেট কার ভাড়া করতে হয়।'

'এটা আপনার সমস্যা। কিন্তু রাত্রে নয়, কাল সকালে ওঁকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার বাবার এ ব্যাপারে সম্মতি আছে তো?'

'ওঁর সাথে এ ব্যাপারে কথা হয়নি।'

'কথা বলুন। উনি ওঁর পুত্রবধূকে হাসপাতালে ভরতি করেছেন। খাতায় ওঁর নাম লেখা হয়েছে। ওঁর অজান্তে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'পেশেন্ট আমার স্ত্রী। তা সত্ত্বেও নয়?'

'কথা বলুন না? উনিও তো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না।' ডাক্তার নাগ হাসলেন, 'আমি অফিসকে বলছি রিলিজ অর্ডার তৈরি করে রাখতে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রবালের সঙ্গে আলোচনা করল প্রণবকুমার। তারা হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানল অ্যাম্বুল্যান্স ওই দূরত্বের জন্যে পাওয়া যাবে না। রিকশা নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এল ওরা। ড্রাইভারদের জিজ্ঞাসা করে জানল কোনও ট্যাক্সিতেই পেশেন্টকে পুরোটা শুইয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। শেষপর্যন্ত একজন খবরটা দিল। একটা লম্বা জিপ পাওয়া যেতে পারে যার ভেতরে বিছানা করলে একজন ঠিকঠাক শুতে পারবে। জিপের সিট দুটো আড়াআড়ি নয়, লম্বালম্বি। ফলে তার ওপর বিছানা/করা যেতে পারে।

জিপওয়ালাকে খুঁজে বের করল প্রবাল। কোথায় যেতে হবে জেনে লোকটা প্রথমে হাজার টাকা চাইল। প্রবাল চেঁচামেচি করে সেটা সাড়ে ছয়শো টাকায় নামালে ঠিক হল সকাল আটটায় ওরা হাসপাতাল ছেড়ে রওনা হবে।

রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রবাল বেশ ভয় পাচ্ছিল বাড়ি ফিরতে। হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। প্রণবকুমার বলল, 'আমি সঙ্গে যাচ্ছি, যা বলার আমি বলব।'

প্রাণকুমার বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, দু'জনকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একী? তুমি আবার ফিরে এলে? বাস চলছে না?'

'আমি এখানে রাত্রে থাকার জন্যে আসিনি।'

'তা হলে?'

'হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি জানালেন পৃথাকে আর ওখানে রাখবেন না। কথাটা আপনাকেও তিনি বলেছেন। অথচ আপনার পক্ষে নাকি এ বাড়িতে পৃথাকে এনে রাখা সম্ভব নয়।' প্রণবকুমার বলল।

'আমার পক্ষে নয়, এ বাড়ির পক্ষে। কিন্তু সে যে এখনও হাসপাতালে আছে তা তোমাকে তোমার ভাইটি জানিয়েছিল?'

'না' এ পাড়ার লোকের মুখেই শুনেছি। হাসপাতালের পথে যাওয়ার সময় প্রবালের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি ওকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছিলাম। যাক গে, পৃথাকে আপনি কোথায় রাখবেন ভেবেছেন?'

'এখনও স্থির করিনি। তেমন হলে বাড়িভাড়া করতে হবে।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'মানে?'

'আমি পৃথাকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই।'

'তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। অতটা রাস্তা বাসে গেলে হয় সে হার্টফেল করবে নয় অ্যাবর্শন হয়ে যাবে।'

'ওসব যাতে না হয় তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

'কী দায়িত্ব নেবে তুমি? ওই দুটোর একটা হলে কী ক্ষতিপূরণ দেবে? দায়মুক্ত হয়ে গেলে আবার বিয়ে করবে। কিন্তু আমি আমার বংশের কথা ভাবব। বউমার পেটে যে আছে সে আমাদের বংশের উত্তরাধিকারী। শুধু তার কথা ভেবে আমি বউমাকে হাসপাতালে দিয়েছি, দু'বেলা ছুটে যাচ্ছি এই বয়সে। সে পৃথিবীতে এসে গেলে তোমাদের কাউকে আমার প্রয়োজন নেই।'

প্রণবকুমার হাসল, 'যে আসছে সে যদি মেয়ে হয়?'

'হতেই পারে না। পণ্ডিতমশাই ঠিকুজি ভাল করে বিচার করে বলে

দিয়েছেন আমার নাতি হবেই।' দৃঢ় গলায় বললেন প্রাণকুমার।

'কিন্তু আমি পৃথাকে বাসে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না।'

'তা হলে?'

'সে আরাম করে শুয়ে যাবে। তার বাবা ডাক্তার। সেখানে যদি তার পুত্রসন্তান হয় তা হলেও সেই সন্তান আপনার উত্তরাধিকারীই হবে। মাঝখান থেকে এই সময়টুকু আপনাকে সমস্যায় থাকতে হবে না।'

'কীভাবে তাকে শুইয়ে নিয়ে যাবে?'

'দেখি। আচ্ছা, চলি।'

'যাচ্ছ মানে? তাকে এখনই নিয়ে যাবে নাকি?'

'না। আমি রাত্রে ঘুমানোর জন্যে হোটেলে যাচ্ছি।'

'শিলচরে থেকে তুমি হোটেলে রাত্রিবাস করলে পাঁচজনের কাছে আমার সম্মান থাকবে? যেভাবে সারাদিন ওই ঘরে ছিলে সেইভাবে রাতটা কাটাও।'

পথ দীর্ঘ। এবং মসৃণ নয়। প্রণবকুমার ড্রাইভারকে বারংবার সতর্ক করে দিচ্ছিল যাতে গতি কম থাকে। একটু ঝাঁকুনি হলেই সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করছিল তার কষ্ট হচ্ছে কিনা।

হাসপাতাল থেকে পৃথাকে রিলিজ করার সময় প্রাণকুমার উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিল মেটাতে হয়েছিল প্রণবকুমারকেই। পৃথাকে যখন জিপে স্ট্রেচারে করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল তখন প্রাণকুমার জিপের পাশে এসে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। যদি সুস্থ থাকো তা হলে ভবিষ্যতে দেখা হবে।' পৃথা কোনও জবাব দেয়নি। সে চোখ সরাতেই প্রবালকে দেখতে পেয়েছিল। প্রাণকুমার একটু দূরে সরে যেতেই প্রবাল এগিয়ে এসে শার্ট তুলে প্যান্টের ভেতর গোঁজা বইটা বের করে পৃথার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'পড়তে পড়তে যেয়ো। আমার জমানো পয়সায় কিনেছি।'

সমস্ত শরীরে যেন খুশির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল পৃথার। গায়ে কাঁটা ফুটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুনশ্চ'। কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠেছিল চোখেমুখে। প্রবাল নেমে গেলে চোখ বন্ধ করেছিল সে। শ্বশুরবাড়িতে

প্রবাল তার কাছে একটু শীতল বাতাস এনে দিয়েছে।

গাড়ি ছাড়ার পরে বইটা খুলল পৃথা। কত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের বই স্পর্শ করছে সে। এই বই তার পড়া হয়নি। কবিতার বই। সে পড়েছে উপন্যাস, গল্প। হঠাৎ একটা পাতায় চোখ আটকে গেল তার। আমি অন্তঃপুরের মেয়ে, চিনবে না আমাকে/ তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু, / বাসি ফুলের মালা।/ তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল/ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে/ পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি/ দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে,/ জিতিয়ে দিলে তাকে।/ নিজের কথা বলি।'

জগৎ সংসার ভুলে গেল পৃথা। তার মনে হল সে কবিতা নয় একটি উপন্যাস পড়ছে যা রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতা বা যোগাযোগেও লেখেননি। এ যদি কবিতা হয় তা হলে তার আকর্ষণ গদ্যের চেয়েও বেশি। প্রবালের প্রতি কৃতজ্ঞতা বেড়ে গেল তার। শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অশান্তি, গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনির কষ্ট যেন এক লহমায় দূর হয়ে গেল।

মাঝে থামতে হয়েছে কয়েকবার। পৃথা খেতে চায়নি, জোর করে তাকে দুধ-মিষ্টি খাইয়েছে প্রণবকুমার। নির্জন পাহাড়ি পথে কোনওরকম সাহায্য না নিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সেরেছে সে। প্রণবকুমারের তখন মনে হয়েছে, একজন আয়াকে সঙ্গে নিয়ে এল ভাল হত। তবু, শেষ পর্যন্ত জিপ গিয়ে পৌঁছাল পৃথার বাড়ির সামনে। তখন রাত প্রায় দশটা।

খবর পেয়ে পুরো বাড়ি জেগে উঠল, একমাত্র মায়াবতী সামনে এলেন না। মেয়ের চেহারা দেখে হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ডাক্তারবাবু। কোনওমতে জিপ থেকে নামিয়ে পৃথার পুরনো বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার ওর প্রেশার দেখলেন। অনেকটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাড়ি খুব দুর্বল। তখনই মেয়ের চিকিৎসা শুরু করলেন তিনি। সামান্য কিছু খাইয়ে ঘুমের ওষুধ দেওয়ার পর জামাইকে নিয়ে বাইরের ঘরে গেলে পৃথার কাছে মায়াবতী এলেন। এসেই বললেন, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোর?'

পৃথা হাসবার চেষ্টা করল। তার পাশে দুই বোন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না সে। মায়াবতীর শরীরের নিম্নভাগের সঙ্গে তার শরীরের নিম্নভাগের কোনও পার্থক্য নেই। মা আবার

মা হচ্ছে? পরের দিন তাকে একা পেয়ে নীতা ক্যাটক্যাট করে বলেছিল, 'শুনছি এবার আমাদের ভাই আসছে। কে এক জ্যোতিষী নাকি বলেছে। আমি ভাবছি কে বয়সে বড় হবে? মামা না ভাগনে অথবা ভাগনি।

পরের দিনটা থেকে গিয়েছিল প্রণবকুমার। এবার তার বিছানা হয়েছিল আলাদা ঘরে। মেয়েকে অনেক প্রশ্ন করেও তার পেট থেকে কোনও খবর বের করতে পারেননি ডাক্তারবাবু। কিন্তু জানতে পেরেছেন টাইফয়েড হওয়ার আগে তাকে কোনও ডাক্তার দেখানো হয়নি। প্রসঙ্গটা জামাইয়ের কাছে তুলেছিলেন তিনি। প্রণবকুমার বিনীতভাবে বলেছিল সে যেহেতু পুনেয় ছিল তাই এসব ব্যাপার তার একদম অজানা। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার বাবাকে আমি চিঠি লিখে জানতে চাইব এরকম অবৈজ্ঞানিক কাজ তিনি কী করে করলেন? হাসপাতালে এত দিন থেকে যেটুকু শরীরের উন্নতি হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে আগে কী ভয়ংকর অবস্থায় ও পৌঁছে গিয়েছিল। ওর শরীরে কোনও প্রতিরোধ শক্তি নেই। তুমি যদি ওকে এখানে না নিয়ে আসতে তা হলে ডেলিভারির সময়েই মারা যেত। কেন তোমার বাবা-মা এরকম অবহেলা করলেন?'

প্রণবকুমার জবাব দিয়েছিল, 'একমাত্র পৃথাই এর কারণ বলতে পারে।'

'সে কোনও অভিযোগ জানাচ্ছে না। তার শিক্ষা, রুচির কারণে তোমার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে বাধছে। তোমাদের পরিবার যে ওকে অপছন্দ করেছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সেকথা আমাকে ওঁরা জানাতে পারতেন। আমি গিয়ে ফেরত নিয়ে আসতাম। তিল তিল করে ওকে মেরে ফেলার কী দরকার ছিল।'

মুখ নিচু করে বসে ছিল প্রণবকুমার।

সন্ধের পর ডাক্তারবাবু যখন চেম্বারে, মায়াবতী নিজের বিছানায়, মেয়েরা পড়ার ঘরে তখন পৃথার কাছে এল প্রণবকুমার, 'এখন কেমন আছ?'

'ভাল।' পৃথা মাটিতে বসে ছিল। সামনে শিলচর থেকে নিয়ে আসা

তার যাবতীয় জিনিস তখনও সুটকেসবন্দি। সে শুধু গ্রামোফোনের বাক্সটা খুলে রেকর্ডগুলো দেখছিল। প্রণবকুমার আসায় হাত সরিয়ে নিল।

'তোমার ওপর এত অত্যাচার হবে আমি ভাবিনি।'

পৃথা জবাব দিল না।

প্রণবকুমার বলল, 'কাল সকালে পুনেয় যেতে হবে। ছুটি নেই। কয়েকটা কথা বলব তোমাকে তাই এসেছিলাম। থাক, তুমি গান শোনো।'

'এখন তো শুনছি না। কত মাস যখন শুনিনি তখন একটু পরে হলে আর কী অসুবিধে হবে।' নিচু গলায় বলল পৃথা।

'তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ?'

'কী?'

'পূর্ণিমার ব্যাপারে। সে যে এখন তার শ্বশুরবাড়িতে আছে তা তো জানো।'

চুপ করে থাকল পৃথা।

'সবাই আমাকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। কেউ যদি আমাকে না জানিয়ে হুট করে চলে আসে তা হলে তো আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝলাম তার উদ্দেশ্য অন্য তখন আমি জোর করে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'কী উদ্দেশ্য? নিস্তেজ গলায় জিজ্ঞাসা করল পৃথা।

প্রণবকুমার তাকাল। কীভাবে বুঝিয়ে বলবে ভেবে পেল না। পৃথা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এবং তখনই তার খেয়াল হল, পৃথার কানে নিশ্চয়ই কেউ কথাগুলো ঢোকায়নি। ওকে এখন এসব কথা না বললেও চলত।

প্রণবকুমার বলল, 'ওসব ছেলেমানুষি ব্যাপার, ছেড়ে দাও।'

'ছেলেমানুষি ব্যাপার সত্ত্বেও ওকে চলে আসতে হল?' পৃথা চোখ সরাচ্ছিল না।

'আসলে, মানে, ও আমার সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মতো থাকতে চাইছিল!'

পৃথা চোখ নামিয়ে নিল। ওর ঠোঁটে অদ্ভুত এক চিলতে হাসি ফুটল।

এই সময় নীতা ঘরে ঢুকল, 'সরি, ডিস্টার্ব করলাম।'

প্রণবকুমার বলল, 'না, না, একটুও না।'

'আপনি তা হলে কালই চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আবার কবে আসবেন?'

'বলতে পারছি না। আমাদের ছুটি পেতে খুব অসুবিধে হয়।'

'এবার এসে দিদিকে শিলচরের বদলে পুনেয় নিয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ, সেইরকম ভেবে রেখেছি।' প্রণবকুমার পৃথার দিকে তাকাল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি। তুমি একটু সঙ্গে আসবে? স্টেশনারি দোকানে যাব।'

'বেশ তো, চলুন।' নীতা বলল।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পৃথা। পূর্ণিমার মুখটা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওই বাড়িতে যেটুকু সাহায্য তা প্রবাল ছাড়া সে পূর্ণিমার কাছ থেকেই পেয়েছিল। সেই পূর্ণিমা তার অস্তিত্ব জানা সত্ত্বেও কেন প্রণবকুমারের সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মতো থাকতে চাইবে? মেয়েরা কি এতটা নির্লজ্জ বেপরোয়া হতে পারে? একই বাড়িতে ওরা কত দিন একসঙ্গে ছিল তা সে জানে না। ব্যাপারটা যে শ্বশুরবাড়িতে কেউ মেনে নেয়নি তা মানদাপিসির কথায় সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। এখন স্পষ্ট হল। প্রণবকুমারেরও কি প্রশ্রয় থাকতে পারে না? ফুলশয্যার পরের রাত থেকে বিছানায় শুয়ে যে লোকটা ভয়ংকর হয়ে উঠত তাকে কি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়? হঠাৎ পৃথার মনে হল সে খামোকা এসব ভাবছে কেন?

পৃথা রেকর্ডটা গ্রামাফোনের বাক্সে তুলে দিল। হাতল ঘুরিয়ে পিনটা রেকর্ডের ওপর নামিয়ে দিতেই গান বেজে উঠল, 'এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো।/ এমনি করে হৃদয়ে মোর/ তীব্র দহন জ্বালো।'

গান ছড়িয়ে পড়ল এই বাড়ির সর্বত্র। চোখ বন্ধ করে শুনছিল পৃথা। ক্রমশ জলে ভিজে যাচ্ছিল চোখের পাতা। হঠাৎ এই ঘরের ভেতর থেকে আর একটি কণ্ঠ রেকর্ডের শিল্পীর সঙ্গে গলা মেলাল, 'অন্ধকারে মোহে লাজে/ চোখে তোমায় দেখি না যে/ বজ্রে তোলো আগুন করে/ আমার যত কালো।/'

ডাক্তারবাবু গাইতে গাইতে মেয়ের পাশে বসলেন। মেয়েকে জড়িয়ে

ধরে বললেন, 'তোর সেই গানটা মনে আছে? 'কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি/ যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;/ ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী/ কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে!/'

একই বিছানায় পাশাপাশি দুটি সদ্যোজাত শিশু যার একটি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকছে। তাদের প্রাকৃতিক কাজগুলোর সময়েও ঘুমঘোর যেন কাটতে চায় না। স্তন্যপান করে চোখ বুজে, পান করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যটির ঘুম ভাঙলেই হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তার কান্নার আওয়াজে ঈষৎ বিরক্ত হয় দ্বিতীয়টি। মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকায় সে। এই দুটিকে নিয়ে নাস্তানাবুদ মায়াবতী। দ্বিতীয়টি তাঁর সন্তান এবং তাকে সামাল দিতে রাতের অনেকটা জেগে কাটাতে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টির দশ দিন আগে জন্মেছে। সঠিক কথা হল পৃথিবীতে এসেছে। মাতৃগর্ভ থেকে বেরুবার পথ ছিল সংকীর্ণ এবং ফরসেপ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে তাকে বের করতে ডাক্তাররা সাহস পাননি কারণ তার মায়ের শরীর সেটা সহ্য করতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয় ছিল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

পৃথাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল দিন দশেক। যেদিন মায়াবতী পঞ্চমবার মা হলেন সেদিন বাড়িতে নিয়ে আসা হল পৃথাকে। হাসপাতালের ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন পৃথা যেন শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ায়। হাসপাতালে মাসখানেক আগে মা হওয়া একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক অর্থের বিনিময়ে শিশুকে দুধ খাইয়ে যেত। তাকে বাড়িতেও আসতে বলা হয়েছিল কিন্তু মায়াবতী দুটি শিশুকেই দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন। পৃথার শরীর তখন কাহিল। বুকে দুধ আসছে না বলাই ভাল। ডাক্তারবাবু নিজের প্র্যাক্টিস ফেলে রেখে মেয়েকে সুস্থ করার যাবতীয় চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

মায়াবতী পঞ্চমবারের মা হওয়ার পরের দিন শিবানীমাসিমা এলেন মিষ্টি নিয়ে। একগাল হেসে আঁতুড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'কী? বলেছিলাম না, কালীপদ ন্যায়তীর্থের গণনায় ভুল হয় না!'

মায়াবতী লাজুক হাসি হাসলেন। তাঁর পাশে দুটি শিশু চোখ বন্ধ, হাত মুঠো করে শুয়ে আছে। শিবানীমাসি তাদের দেখলেন, 'পৃথার মেয়ের ওজন বেশ কম হয়েছে। বড্ড রোগা দেখাচ্ছে।'

'প্রাণে বেঁচে আছে এই ঢের।' মায়াবতী বললেন।

'সে কোথায়?'

'ওপাশের ঘরে আছে।'

'ঠিক আছে। পরে আবার আসব।'

শিবানীমাসি পা বাড়াতেই নীতার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোর দিদি কোথায়? ঘুমাচ্ছে?'

'ওই ঘরে।'

শিবানীমাসিমা সেই ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলতেই গান শুনতে পেলেন। গ্রামাফোনে রেকর্ড বাজছে, 'যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে/ জীবন মরণে;/ গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।/

খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে শীর্ণ চেহারার পৃথা। একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর রাখা। গ্রামাফোনের বাক্সটা খাটের লাগোয়া টেবিলে রয়েছে। শিবানীমাসিমা দেখলেন মেয়েটার কনুইয়ের হাড় বড্ড স্পষ্ট।

তিনি দরজা ভেজিয়ে দিলেন। এখন ওকে ডাকা ঠিক হবে না।

মেয়ের যখন চার মাস বয়স তখন প্রণবকুমার তার মুখ দর্শন করল। সেই সঙ্গে মেয়ের সমবয়সি শ্যালককেও। অঙ্কের হিসেবে শ্যালক মেয়ের চেয়ে ছোট।

প্রণবকুমার পুনে থেকে দিল্লিতে বদলি হয়েছে। ফ্যামিলি নিয়ে যাবে বলে তাকে দু'ঘরের সুন্দর কোয়ার্টার্স দিয়েছে অফিস থেকে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ইচ্ছে ছিল না শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই পৃথা এ বাড়ি থেকে চলে যাক। তা ছাড়া ওর পক্ষে বাচ্চা সামলানো অসম্ভব ব্যাপার। এই চার মাসে মায়াবতী বারকয়েক বাচ্চাকে পৃথার কাছে নিয়ে গেছেন। পৃথা দেখেছে কিন্তু কোলে নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি। বাচ্চার ব্যাপারে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তার পক্ষে কী করে একা একা সামলানো সম্ভব?

ডাক্তারবাবু মেয়েকে আলাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কী চাইছিস, বল?'

'আমি শুধু একটা অনুমতি চাই।' পৃথা নিচু গলায় বলল।

'নিশ্চয়ই। সেটা কী?'

'আমি যেখানেই যাই না কেন, তা শিলচর হোক কিংবা দিল্লি, আমাকে রেকর্ডের গান শুনতে দিতে হবে, বই পড়তে বাধা দেওয়া হবে না।' পৃথা বলল।

ডাক্তারবাবু মেয়ের মাথায় হাত বোলালেন, 'বাঃ। আমি প্রণবকুমারের সঙ্গে কথা বলব মা। তোর এই সামান্য চাওয়াটা ওদের মেনে নিতে হবেই।'

শিলচরের বাড়িতে পৃথা গেলে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু দিল্লিতে গেলে সে পৃথার ওই চাওয়ায় কোনও বাধা দেবে না তা প্রণবকুমার জানিয়ে দিল। বাচ্চার জন্যে একজন আয়া রাখলে তার দেখাশোনার কোনও অসুবিধে হবে না। জামাইয়ের কথায় বেশ আশ্বস্ত বোধ করলেন ডাক্তারবাবু।

এবারে প্রণবকুমারের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা না করে পৃথার ঘরেই তার শোওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মায়াবতী। তিনি লক্ষ করছিলেন, রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার পরেও ওদের ঘরের দরজা বন্ধ হচ্ছে না। তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এখনও, এতগুলো সন্তানের মা হওয়ার পরেও স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ না শুলে তাঁর ভাল ঘুম হয় না। ফলে তাঁকে দরজাটা বন্ধ করতে হয়। কত দিন পরে ওরা একসঙ্গে হয়েও কেন দরজা বন্ধ করছে না তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'ভালই করছে। এখনও দুর্বলতা যায়নি মেয়ের। ওর শরীর এত ভেঙে গিয়েছে যে আবার যদি মা হয় তা হলে কিছুতেই বাঁচবে না। প্রণবকুমারও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছে।'

মায়াবতী বললেন, 'কী জানি। তোমার মেয়েকে আমি একটুও বুঝতে পারি না।'

'কেন?' স্ত্রীর পাশে শুয়ে ডাক্তারবাবু হাসলেন।

'কোন মা তার সন্তান সম্পর্কে এতটা উদাসীন হয়?' মায়াবতী জিজ্ঞাসা

করলেন, 'সারাদিনে একবারও চোখের দেখা দেখতে চাইবে না?'

'শরীরের জন্যে ও পেরে উঠছে না!'

'আমার মনে হয় তুমিই এর জন্যে দায়ী।'

'আমি?' ডাক্তারবাবু অবাক, 'আমি কীভাবে দায়ী হলাম?'

'ওই যে, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বলে বলে ওর মনটাকে এমন বিগড়ে দিয়েছ যে আর পাঁচটা স্বাভাবিক মেয়ের মতো ব্যবহার করতে পারছে না।'

জোরে হাসতে গিয়ে সামলে নিলেন ডাক্তারবাবু, 'তোমরা ওকে ভুল বুঝছ। ওর ওপর দিয়ে যে ভয়ংকর ঝড় বয়ে গিয়েছে তা অন্য মেয়ে হলে সহ্য করতে পারত না। এটা তুমি বুঝবে না।'

ডাক্তারবাবুর নির্দেশে রাতের খাবার সাড়ে আটটায় খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে হত পৃথাকে। প্রণবকুমার যখন বিছানায় আসত তখন সে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। প্রায় দেড় বছর পরে স্ত্রীর পাশে নির্জন ঘরে এসে প্রণবকুমারের ইচ্ছে হত হাত বাড়াতে। কিন্তু গভীর ঘুমে নেতিয়ে থাকা পৃথাকে জাগাতে ইচ্ছে হয়নি তার। সে লক্ষ করেছিল পৃথার শরীর যেন একটু ছোট, প্রায় পাখির মতো দেখাচ্ছে। প্রথম রাতে দরজাটা বন্ধ করেছিল প্রণবকুমার। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পেয়েছিল সেটা খোলা। অর্থাৎ পৃথাই বাথরুম থেকে ফিরে আর বন্ধ করেনি। পরের রাত থেকে দরজা বন্ধ করার কথা ভাবেনি প্রণবকুমার।

সিদ্ধান্ত হল, প্রণবকুমার পৃথাকে নিয়ে দিল্লিতেই যাবে। এ যাত্রায় সে শিলচরে যাচ্ছে না। পৃথার মেয়ে হওয়ার খবর ডাক্তারবাবু শিলচরে দিয়েছিলেন। তার উত্তরে প্রাণকুমার চিঠি লিখেছিলেন, 'আপনার মেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হোক, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।' ব্যস, এটুকুই। নাতনি সম্পর্কে কোনও ঔৎসুক্য নেই।

প্রণবকুমারকে কথাটা বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণবকুমার বলেছিল, 'আমি সঠিক জানি না তবে অনুমান করতে পারি। ওঁরা বংশধর হিসেবে একটি পুত্রসন্তান আশা করেছিলেন। মেয়ে হওয়ায় নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়েছেন।'

কাল সকালে পৃথা তার স্বামীর সঙ্গে দিল্লি চলে যাবে। গোছগাছ হচ্ছিল। এই সময় শিবানীমাসি এলেন। বিয়ের সময় দেখা হয়েছিল কিন্তু ভাল করে কথা হয়নি। প্রণবকুমারের সামনে চেয়ারে বসে শিবানীমাসি বললেন, 'তোমার মাকে মনে আছে?'

'অল্পই।' প্রণবকুমার বললেন।

'তিনি আমার বড় ননদ ছিলেন।'

ঘরে তখন মায়াবতী এবং পৃথাও। মায়াবতী বললেন, 'তুমি জানো কি না জানি না, তোমাদের খবর শিবানীমাসিমাই দিয়েছিলেন। চা খাবেন তো?'

'হ্যাঁ।' শিবানীমাসিমা হাসলেন।

মায়াবতী উঠে গেলে প্রণবকুমার বলল, 'যোগাযোগ ছিল না তো তাই—!'

'কী করে থাকবে? তোমার বাবা আবার বিয়ে করলেন। বিয়ের সময় উনি যখন এসেছিলেন তখন আমি ইচ্ছে করেই ওঁর সামনে যাইনি।' শিবানীমাসিমা বললেন, 'তা ছাড়া আমি তো ছেলের জন্যে কোথাও চার-পাঁচ বছরের বেশি থাকতে পারি না। ওর বদলির চাকরি। এই তো আজই বদলির অর্ডার এল।'

পৃথা চোখ তুলল। শিবানীমাসিমা বললেন, 'ডিব্রুগড়।'

'কোথায় চাকরি করেন উনি?' প্রণবকুমার জানতে চাইল।

'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। যাক গে, বউকে নিয়ে যাচ্ছ, ভাল কথা। কিন্তু ওর যা শরীরের অবস্থা, কোনও পরিশ্রম করতে পারবে না। সেটা দেখো।'

'দেখব।' হাসল প্রণবকুমার।

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলুন।'

'তোমার কোনও আত্মীয় কুচবিহারে থাকেন?'

'না তো।'

'তা হলে নিশ্চয়ই আমার ছেলে ভুল দেখেছে। তোমাকে নাকি একটি মেয়ের সঙ্গে রিকশায় যেতে দেখেছে সে। আমি ভাবলাম, হয়তো কোনও আত্মীয়া আছে ওখানে।'

শিবানীমাসির কথা শেষ হলে পৃথা অদ্ভুত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল।

সারারাত কথা বলেনি পৃথা। প্রণবকুমারের সঙ্গে দূরের কথা, বাড়ির কারুর সঙ্গেও নয়। সকালে ডাক্তারবাবুকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাকে কি যেতেই হবে?'

'গিয়ে যদি খারাপ লাগে তা হলে আমি তোকে নিয়ে আসব।'

'আমার আর কলেজে পড়া হল না!'

ঢোঁক গিললেন ডাক্তারবাবু। এইরকম সময়ে স্ত্রীর ওপর খুব রাগ হয় তাঁর। কোনও দরকার ছিল না হুট করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার।

'জামাইকে কি বলব দিল্লির কলেজে তোকে ভরতি করে দিতে?'

'না!' জোরে বলে উঠেছিল পৃথা।

'তুই এক কাজ কর। মেয়েকে এখনই নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তুই ওখানে গিয়ে দ্যাখ, মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারবি কি না! এর মধ্যে তোর মেয়ে নিজে হাঁটা চলা করতে শিখুক। তখন ঝামেলা অনেক কমে যাবে, নিয়ে যাস।'

গাড়ি নিয়ে আসা হল। গ্রামাফোনের বাক্স থেকে কিছু বই, জামাকাপড় তোলা হল ডিকিতে। বাবাকে প্রণাম করে যখন মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে পৃথা তখন মায়াবতী না বলে পারলেন না, 'তুই কী রে!'

পৃথা তাকাল।

'যাওয়ার সময় মেয়ের কথা মনে আসছে না? ওকে একবার দেখে যাবি না?'

'তুমি তো আছ। তোমার কাছেই তো ওকে রেখে যাচ্ছি।'

'হাজার হোক তুই ওর মা, আমি দিদিমা।'

'না। তুমি ওর দুধমা। তোমার দুধ খেয়ে ও বেঁচে আছে। থাকবে।'

মায়াবতী আর পারলেন না। দৌড়ে ভেতরে গিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন। পৃথার বিয়ের পর চলে যাওয়ার সময়েও তাঁর চোখ উপচে এত জল আসেনি। চোখ মুছতে মুছতে ঝাপসা দেখতে পেলেন দুটো বাচ্চার একটা জোরে জোরে শব্দ করছে, পা ছুড়ছে, খুশিতে, দ্বিতীয়টি স্থির হয়ে

শুয়ে প্রথমটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর খুশির কী কারণ সে বুঝতেই পারছে না।

মায়াবতী দ্বিতীয়টিকে কোলে তুললেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তুই কি একটু কাঁদতেও জানিস না!'

দিল্লির এয়ারফোর্সের কোয়ার্টার্স এমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু ছিমছাম, পরিষ্কার। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় এত কাহিল হয়ে পড়েছিল পৃথা যে দু'দিন দু'রাত প্রায় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। এই দু'দিন অফিস সামলে যা পেরেছে তাই রান্না করেছে প্রণবকুমার। পৃথাকে তুলে তাই খেতে দিয়েছে। পৃথা নির্লিপ্ত মুখে খেয়ে নিয়েছে। অফিসে যাওয়ার সময় বাধ্য হয়ে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছে প্রণবকুমার। দুদিন পরে কাজের লোক পেল সে। ঠিকে লোক। রান্না থেকে ঘর পরিষ্কার, সবই করবে। তাকে প্রণবকুমার বলে দিল, 'আমার বউয়ের শরীর খুব খারাপ। ওকে একটুও বিরক্ত করবে না। যা দরকার হবে তা আমাকে বলবে।' কোয়ার্টার্সের দুটো ঘরের ফার্নিচার খুবই অল্প। ডাবল খাট দূরের কথা, একটি ঘরে সিঙ্গল তক্তাপোশ, অন্য ঘরে দড়ির খাটিয়া পাতা। অতএব এক ঘরে শোওয়ার সুযোগ নেই। প্রণবকুমার খাটিয়াতেই। তৃতীয় দিন অফিস থেকে ফিরে দরজায় তালা খোলার সময় গান শুনতে পেল প্রণবকুমার। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের গান, তুমি যে আমার কবিতা। কয়েক সেকেন্ড শুনে বুঝতে পারল এটা রবীন্দ্রসংগীত নয়। ভেতরে ঢুকে পৃথার ঘরে গিয়ে দেখল গ্রামাফোনে রেকর্ড বাজছে আর পৃথা তক্তাপোশে বসে চোখ বন্ধ করে শুনছে। গান শেষ হলে সে উঠে পা বাড়াতেই প্রণবকুমারকে দেখতে পেল।

প্রণবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে আজ শরীর ভাল হয়েছে।'

'হুঁ।'

'গান শোনা থেকেই বুঝতে পারছি। তুমি তা হলে আধুনিক গান শোনো!'

'ভাল গান হলেই শুনি।'

'আমি তো সারাদিন বাড়িতে থাকি না, তখন রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পারো।'

'কেন?'

'আমার কীরকম ন্যাকা ন্যাকা মনে হয়।'

'ও।' গ্রামাফোন বন্ধ করল পৃথা। এই সময় কাজের মেয়েটি এসে গেল। প্রণবকুমার তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেক দিন পরে পৃথা সারা সন্ধ্যা প্রবালের দেওয়া পুনশ্চ বইটি নিয়ে পড়ে থাকল। একটা লাইন চোখে পড়তে মন কী ভাল হয়ে গেল। বৃষ্টি ধোওয়া আকাশ। যেন এক ঈশ্বর মনের মধ্যে অপূর্ব আলো জ্বেলে দিয়ে গেলেন।

নিয়ম মেনে সাড়ে আটটায় পৃথাকে খেতে দিলেও প্রণবকুমার দেরিতে খায়। সে গতকাল এক বাঙালি সহকর্মীকে বলেছিল—বাংলা বই জোগাড় করে দিতে। পৃথা পেলে খুশি হবে। আজ সহকর্মী দুটো বই দিয়েছিল। পৃথার খাওয়া শেষ হলে সেই বই দুটো নিয়ে প্রণবকুমার ওর ঘরে ঢুকল।

'তুমি তো বই পড়তে ভালবাসো, নাও।' বই দুটো পৃথাকে দিয়ে পাশে বসল প্রণবকুমার। বই দেখে খুশি হয়েছিল পৃথা কিন্তু নাম পড়ে অবাক হল, 'এগুলো কী বই? মোহন সিরিজের বই। শশধর দত্ত। আমি এগুলো পড়ি না।'

'গল্পের বই তো। না পড়ার কারণ কী?'

'এগুলো থেকে কিছু পাওয়া যায় না।'

'কে বলল?'

'বাবা। একবার এরকম বই এনে বাবা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল, যেমন অবাস্তব তেমন কাঁচা লেখা।'

'তোমার বাবাই শেষ কথা বলছেন ভাবছ কী করে?'

পৃথা জবাব দিল না। প্রণবকুমার বলল, 'ওই যে বইটা, মোহন ও রমা, পড়ে দ্যাখো, খুব রোমান্টিক মনে হচ্ছে।'

পৃথা বই দুটো সরিয়ে দিল। প্রণবকুমার বেশ আহত হল। সে দু'হাতে পৃথাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনের চেষ্টা করতেই পৃথা 'আঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। শব্দটা এত জোরে বাজল যে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল প্রণবকুমার, 'কী হল?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ সময় নিল পৃথা, নিজেকে স্থির করতে।

প্রণবকুমার বলল, 'আমি এমন জোরে ধরিনি যে তোমাকে চেঁচাতে হল।'

'এসব না করলেই ভাল।' পৃথা কেটে কেটে বলল।

'কেন?'

'আমার ভাল লাগে না।'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী। স্বামী হিসেবে আমি তো তোমার কাছে আনন্দ পেতে চাইব।'

'কী আনন্দ? যা একজনকে আনন্দ দেয় তা যদি আর একজনের মনে ঘৃণা আনে তা হলে? তা হলেও সায় দিতে হবে?'

'মানে? তুমি সেক্সকে ঘেন্না করো?'

'সেক্স কি তাই তো আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! ফুলশয্যার পরের রাতগুলোয় যা হয়েছিল তা ভুলে গেছ?'

'ওকে যদি সেক্স বলে তা হলে পশুরাও তো একই কাজ করে। মুশকিল হল, পশুদের মন ও ব্যাপারে তৈরি থাকে না, ঘেন্নাও নেই।'

'তার মানে, তুমি তখন খুশি হওনি।'

'না। ভয় পেয়েছি। আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করা হয়নি আমি চাই কি না! আমার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হওয়ার আগেই শরীরের ওপর পড়লে কী করে খুশি হব।'

প্রণবকুমার উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'তুমি এখনও দুর্বল। তাই কোনও জোর করব না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ফ্রিজিড উওম্যান, তুমি তাই।'

'ব্যাপারটা কি তাও তো আমি জানি না। তা ছাড়া, একটা কথা—।' থেমে গেল পৃথা। প্রণবকুমার বলল, 'শেষ করো।'

'আমার আগে এবং পরে নিশ্চয়ই উলটো ধরনের মেয়ের সঙ্গে ওই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে নিজে গিয়েছিল না সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা আমি জানি না। আমি তো কোনও বিরক্ত করি না। করতামও না। তা হলে সে কেন পুনে থেকে আলিপুরদুয়ারে চলে গেল! তাকে রাখলে তো আফশোস করতে হত না।' পৃথা কথাগুলো বলে জ্বলন্ত চোখে প্রণবকুমারের দিকে তাকাল।

সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে গেল প্রণবকুমার। তারপর কথা না বলে বই দুটো তুলে নিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

বাড়ির কাছেই বাঙালিদের একটা লাইব্রেরি আছে। হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো লাগে। সেখানকার মেম্বার হয়ে গেল পৃথা। এবার আসার সময়ে ডাক্তারবাবু জোর করে ওর সুটকেসে তিনশো টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মেম্বারশিপের চাঁদা তা থেকেই দিয়েছিল সে। একের পর এক শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ করতে লাগল সে। রান্না করে কাজের লোকটি। সে যদি কামাই করে সেদিন প্রণবকুমার রান্নাঘরে ঢোকে। বই হাতে পেলে গোটা দিন না খেতে পেলেও কোনও অসুবিধে হয় না পৃথার। একদিন কাজের মেয়ে আসেনি, প্রণবকুমারের বেশ জ্বর। বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়িতে চাল আলু ডিম বসিয়ে নিজের ঘরে ফিরে বই নিয়ে বসেছিল সে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক।

এমন মজে গিয়েছিল যে সময় খেয়ালে ছিল না। পোড়া গন্ধ নাকে আসতে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি। শেষতক ছুটে গিয়েছিল রান্নাঘরে। ভাতের ফ্যান উপচে তো পড়েইছে, ভাত আলু পুড়ে প্রায় শুকিয়ে আছে। সেগুলো পরিষ্কার করে নতুন জলে চাল ছাড়তে হয়েছিল আবার।

ডাক্তারবাবুর চিঠি আসত প্রতি সপ্তাহে। পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে কাজের মেয়েকে দিয়ে পোস্ট করাত। দায়সারা উত্তর। আরণ্যক শেষ করে সে একটা বড় চিঠি লিখল। আমার বাবা, আজ আরণ্যক শেষ করলাম। গতকাল বাধ্য হয়ে রান্না করতে গিয়ে একটা কাণ্ড করেছি। বইতে এত মগ্ন ছিলাম যে ভাত পুড়ে গিয়েছিল। যাক গে, আমি ভাল আছি। তারাশঙ্করের বেশির ভাগ বই পড়া হয়ে গেছে। খুউব ভাল লেখা। কিন্তু বাবা, বিভূতিভূষণের লেখা পড়লে মনে হয় এ সবই আমার কথা। যেন আমিই লিখছি। প্রকৃতির বর্ণনা যেমন অপূর্ব তেমনি মানুষের মনের অন্দরমহলে নিঃসাড়ে ঢুকে পড়েন তিনি, কখন কেমন করে, টের পাওয়া যায় না। আমাদের এখানে যে লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছি তার লাইব্রেরিয়ান মানুষটি খুব ভাল। আমি কবিতা পড়ি জেনে বলেছেন জীবনানন্দ দাসের কবিতা পড়তে। আজ আরণ্যক পালটে তাঁর বই আনতে দেব। আর হ্যাঁ,

আমাকে কিন্তু নতুন রেকর্ড কিনতে হবে। তুমি যে টাকা দিয়েছিলে তার প্রায় সবটাই তো রয়ে গেছে। এখানকার রাস্তাঘাট তো আমি চিনি না। আচ্ছা, তুমি তো একবার এখানে আসতে পারো। তুমি এলে এখানকার দোকান থেকে তোমার পছন্দের রেকর্ড কিনে দিতে পারো। মাকে আমার প্রণাম দিয়ো। নীতাকে বলবে আমাকে চিঠি দিতে। ইতি তোমার মেয়ে, পৃথা।' এই চিঠি খাম আনিয়ে ঠিকানা লিখে কাজের মেয়েকে দিল সে। ভুলেও তার মনে পড়ল না মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে।

চিঠি পেয়ে ডাক্তারবাবু একাই এলেন। মেয়ের বাড়িতে না উঠে উঠলেন দিল্লির কালীবাড়িতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেয়ের কাছে কাটাতেন। প্রণবকুমার এ কারণে অসন্তুষ্ট হলেও পৃথা খুশি হয়েছিল। বলেছিল, 'এখানে তুমি কোথায় শোবে? কাজের মেয়ের রান্না তুমি মুখে তুলতে পারবে না। তুমি এসেছ বলে দুপুরবেলায় তোমার সঙ্গে গিয়ে কোনওদিন ম্যাড্রাসি, কোনওদিন পাঞ্জাবি খাবার খেতে পাচ্ছি।' প্রচুর রেকর্ড কিনে দিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

দু'বছরের মাথায় প্রণবকুমার পৃথাকে নিয়ে গেল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পৃথাকে দেখে খুশি হলেন মায়াবতী। আগের মতো দুর্বল নেই বটে কিন্তু গায়ে মাংস লাগেনি। ওরা গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র দুটো আড়াই বছরের শিশু দৌড়ে এল। দু'জনেরই চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা, পোশাকও ছেলেদের।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কে?'

দ্বিতীয় জন চুপ করে রইল।

নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা বল এরা কে?

দু'জনে চুপ করে আছে দেখে নীতা পৃথার দিকে তাকাল, 'এবার তুই বল দিদি, তোর মেয়ে কোনটা?'

পৃথা তাকাল। দু'জনের চেহারা খুব কাছাকাছি।

প্রথম জন প্রতিবাদ করল, 'আমি মেয়ে নই।'

দ্বিতীয় জনের দিকে তাকাল পৃথা। একেবারে পুতুলের মতো দেখতে।

প্রথম জন বলল, 'আমার নাম জানো। পলাশ। ওর নাম পর্ণা। ও মেয়ে।'

প্রণবকুমার মেয়েকে ডাকল, 'এদিকে এসো।'

শোনামাত্র ভেতরে দৌড়াল মেয়ে। পেছন পেছন ছুটল প্রণবকুমার। একদিনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল বাবা আর মেয়ের। তখন বাবার কাছ থেকে সে নড়তেই চায় না। তাই দেখে মায়াবতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার মেয়েকে নিয়ে যাবি নাকি?'

'জানি না।' পৃথা বলেছিল।

'ও চলে গেলে আমাদের খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু বাবাকে পেয়ে ওর যা চেহারা হয়েছে তাতে মনে হয় গেলেই ভাল থাকবে।' মায়াবতী বললেন।

ইচ্ছেটা প্রণবকুমারেরও। এক দুপুরে ঘরে একা শুয়ে ছিল পৃথা। মেয়ে এল পায়ে পায়ে। খাটের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

পৃথা সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে।'

পর্ণা বড় চোখে তাকাল, 'আচ্ছা, তুমি কি আমার মা?'

মাথা নাড়ল পৃথা। হ্যাঁ।

'ও।' বলে পেছন ফিরল পর্ণা, তারপর ওই অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ।'

'কে বলেছে?'

'মামাই, দাদু।'

'তুমি এখানে এসে বসো।'

ফিরে এসে খাটে বসল পর্ণা। পৃথা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি পড়তে পারো?'

'দাদু পড়ায়। অনেক ছড়া-শিখিয়েছে।'

'একটা বলবে!'

চোখ বন্ধ করল পর্ণা। তারপর বলল, 'আমি যদি দুষ্টুমি করে/ চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,/ ভোরের বেলা মা গো, ডালের পরে/ ডালের পরে—,' হাত নাড়ল সে। বোঝা গেল মনে করতে পারছে না।

পৃথা বলল, 'কচিপাতায় করি লুটোপুটি।'

পর্ণা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলবে না। তবে তুমি আমার কাছে হারো,/ তখন কি মা, চিনতে আমায় পারো।'

মেয়ের মাথায় হাত রাখল পৃথা, 'বাঃ। ভাল হয়েছে। আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন আমার বাবা এই কবিতাটা আমায় শিখিয়েছিলেন।'

'আমাকে আমার দাদু শিখিয়েছে।' গর্বের গলায় বলল পর্ণা।

'কবিতাটির নাম বলতে পারবে?'

'লুকোচুরি।' বলেই দৌড়াল পর্ণা। শ্বাস পড়ল পৃথার। বেশ ভারী।

দিল্লিতে নিয়ে এসে স্কুলে ভরতি করে দিল মেয়েকে। প্রণবকুমারই উদ্যোগী হয়েছিল। পৃথাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছিল, 'যা ভাল মনে হয়, তাই করো।' অতএব এয়ারফোর্সের এলাকার মধ্যে একজন গুজরাতি মহিলা যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল করেছেন সেখানে পর্ণা যাতায়াত শুরু করল। স্কুলে যাওয়ার আগে সে মাকে বই পড়তে দেখে যেত। দুপুরে ফেরার পরও সেই এক দৃশ্য। একদিন কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এত কী পড়ো?'

'মানুষের কথা, জীবনের কথা। তুমি এখন বুঝবে না।'

'কেন বুঝব না?'

'কারণ তুমি এখন ছোট।'

'কে লিখেছে বইটা?'

'মানিক বন্দোপাধ্যায়।'

প্রণবকুমার মেনে নিয়েছে। সেই ঘটনার পর আর কখনও সে পৃথার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেনি। পৃথা যে সারা দিন বই পড়ে আর গান শুনে কাটিয়ে দেয় তাতেও সে আপত্তি জানায়নি। মেয়েকে নিয়ে আসার পরে তার মন বেশ ভাল হয়ে গেল। বাড়িতে এলে চমৎকার সময় কাটে। সে লক্ষ করেছে মেয়ে একটু একটু করে হিন্দি শব্দ ব্যবহার করছে। একটি বাংলা বাক্যে হিন্দি শব্দ ব্যবহার করছে নিজের অজান্তেই। ক্রমশ হিন্দিতে কথা বলার প্রবণতা বাড়ল পর্ণার। ওর বয়সি কোনও মেয়ে আশেপাশে নেই যে বাংলায় কথা বলে, ক্লাসেও কোনও বাঙালি মেয়ে নেই। যারা আছে তারা হয় পাঞ্জাবি নয় হিন্দিতে কথা বলে। হিন্দিভাষা শেখার জন্যে ক্রাশও আছে। তাই হিন্দি কথা বলার অভ্যেসটা বেশ দ্রুত তৈরি হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ইংরেজিও। স্কুলের ম্যাডামরা প্রণবকুমারকে ডেকে বলেছেন যাতে বাড়িতেও পর্ণার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা হয়। তাতে ওর ইংরেজিতে কথা বলা সহজ হবে।

কথাটা প্রণবকুমার পৃথাকে বলেনি। শুনলে পৃথা যে বিরক্ত হবে তাতে তার কোনও সন্দেহ ছিল না। হয়তো বলবে দিল্লির একটি ভাল বাংলা স্কুলে মেয়েকে ভরতি করে দিতে। কিন্তু প্রণবকুমারের মনে হয়েছে হিন্দি এবং ইংরেজি শিখলে মেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট হবে। তা ছাড়া সে খুশি হয়েছিল এই ভেবে এতে পৃথাকে একটু জব্দ করা যাবে। যার বাংলা বই ছাড়া ঘুম হয় না, রবীন্দ্রনাথ যাকে পাগল করে রেখেছে, তার মেয়ে যদি বাংলা ভুলে অন্য ভাষায় দক্ষ হয় তা হলে বাবা হিসেবে সে খুশি হবে।

স্কুল থেকে ফিরে এখন নিজেই বাথরুমে ঢুকে স্নান করতে পারে পর্ণা। সে স্নানে ঢুকলে বই ছেড়ে উঠতে হয় পৃথাকে। প্রণবকুমার এখন অফিসে, কাজের মেয়েও চলে যায়। তাই দুপুরের খাবার মেয়েকে বেড়ে দিতে হয় তাকে। তখনই কানে এল, পর্ণা গান গাইছে, 'এক লেড়কি ভিগি ভাগিসি—।' থমকে গেল সে। এই প্রথম মেয়ের গলায় গান শুনল সে। কিন্তু হিন্দি গান কেন? সে চুপ করে বসে রইল। স্নান করে চুল মুছে পর্ণা এল চিরুনি নিয়ে, 'আঁচড়ে দাও।'

'তুমি তো রোজ আমাকে বাংলাগান শুনতে দ্যাখো, তোমার কানে যায় না?'

'যায়।'

'শুনতে শুনতে শেখা হয়ে যায়, শিখেছ?'

'না। শুনলে কেমন ঘুম ঘুম পায়।'

'মানে?' চমকে উঠল পৃথা।

'মতলব, আমার আচ্ছা লাগে না।'

'এই হিন্দিগান খুব ভাল লাগে?'

'হ্যাঁ। স্কুলে যখন কেউ গান গায় আমরা ডান্স করি। তুমি যে গান শোনো তার সঙ্গে ডান্স করা যায় না। বোরিং।'

'কী? কী বললে?' ঠাস করে চড় মারল পৃথা। পর্ণা অবাক। গালে হাত দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে হিট করলে?'

'এইটুকু মেয়ে, কী বোঝো তুমি গানের? বোরিং, বোরিং বলা হচ্ছে। তোমার মুখ দিয়ে যে বলাচ্ছে সে তো বলেছে ন্যাকামি। উঃ। মাগো!' দু'হাতে নিজের মাথা ধরল পৃথা। তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

প্রায় তিরিশ সেকেন্ড ধরে মাকে দেখে পর্ণা বলল, 'আই অ্যাম সরি। আর কখনও বলব না। নেভার।'

চোখ মুছে মেয়েকে খাবার বেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল পৃথা। সেদিন তার খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে পর্ণা এসে বসল তার পাশে, 'মা, আমি সরি।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি যে গান শোনো সেগুলো কি প্রেয়ার সঙ?'

'মানে?'

'ম্যাডাম বলেন, প্রেয়ার সঙের সঙ্গে নাচতে নেই।'

ওই অবস্থাতেও হেসে ফেলল পৃথা। চোখ থেকে হাত সরাল। তারপর বলল, 'উনি ঠিকই বলেন।'

'তুমি কাকে প্রেয়ার করো? হু ইজ ইয়োর গড? জেসাস?'

'না।'

'তবে?'

'রবীন্দ্রনাথ।'

'উনি কি খুব বড় গড?'

'আমার কাছে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল পর্ণা। তারপর বেশ উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওই নামটা দাদুও বলত। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'দাদু একটা পোয়েম শিখিয়েছিল আমাকে। সেটার মধ্যে কোনও প্রেয়ার ছিল না। ওই যে লুকোচুরি পোয়েমটা, ওটাও তো প্রেয়ার নয়।'

'তুমি জল খাও তো, কেন খাও?'

'আমি থার্স্টি হলে জল খাই।'

'কিন্তু সেই জল মুখ থেকে গলা দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে সব ধুইয়ে দেয় তা কি বুঝতে পারো?'

'না।'

'সেটা যখন বুঝতে পারবে তখন জানবে ওই লুকোচুরি কবিতাও একটা প্রার্থনা সংগীত।'

'তুমি খাবে না?' আচমকা অন্য কথা বলল পর্ণা।

'না।'

'চলো না, আমি তোমাকে খাবার বেড়ে দেব।' পর্ণা উঠে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে পৃথা বলল, 'বেশ।'

বাইরের ঘরের দরজায় কড়া নড়লেই পর্ণা ছুটে যায়। চেয়ার টেনে তার ওপরে উঠে ছিটকিনি খোলে। প্রণবকুমার অনেক নিষেধ করেছে কিন্তু কে কার কথা শোনে, এয়ারফোর্সের এলাকায় কোয়ার্টার্সগুলোতে ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের ভয় নেই কিন্তু চেয়ার থেকে পড়ে গেলে মেয়ের যে হাত পা ভাঙবে তা ওকে বোঝানো যাচ্ছে না।

আজও দরজা খুলে পর্ণা জিজ্ঞাসা করল, 'কিসকো চাহিয়ে?'

'প্রণবকুমার—।'

'ঠারিয়ে।' মেয়ে ছুটল বাবার ঘরে। আজ রবিবার। সকালের এই সময়টায় খবরের কাগজ পড়ে প্রণবকুমার। মেয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'তোমাকে ডাকছে—।'

'কে?'

'নেহি জানতা।'

অতএব প্রণবকুমারকে যেতে হল। দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই সে অবাক। প্রবাল দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মুখে। তাকে দেখে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে দিল।

'কার চিঠি। ভেতরে আয়!'

প্রবাল নড়ল না। খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করল প্রণবকুমার।

'তোমাকে সম্বোধন জানিয়ে চিঠি শুরু করার মতো মন আমার নেই। যে ছেলে পুনে থেকে শ্বশুরবাড়িতে এসে দিন কাটিয়ে ফিরে যায়, বাবা মায়ের কাছে আসার প্রয়োজন বোধ করে না, তাকে কী বলে সম্বোধন করব! তুমি যে পুনে থেকে দিল্লিতে গিয়েছ সেই খবর তোমার শ্বশুরমশাইয়ের চিঠিতে জানতে হল। তাঁর কাছ থেকেই ঠিকানা নিয়ে এই চিঠি লিখছি। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

তবু চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি আমার মানসম্মান ধুলায় শুধু মিশিয়ে

দাওনি, একটি মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার জীবন নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছ। তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলে, একবারও ভাবোনি সেখানে তার ওপর কত ভয়ংকর অত্যাচার হতে পারে। অথবা ভেবেই তুমি তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলে।

শেষপর্যন্ত তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। দু'দিন রাখার পর আমি প্রবালকে বলেছি তাকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে। কারণ তার এই অবস্থার জন্যে তুমি ছাড়া কেউ দায়ী না। ইতি, প্রাণকুমার।'

চিঠি পড়ে মুখ তুলল প্রণবকুমার, 'তুই ওকে নিয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন নিয়ে এলি?'

'কর্তামশাই হুকুম করলেন।'

'তুই কি এত নির্বোধ যে হুকুম করলেই তা শুনবি। ও এখানে থাকলে যে কী আগুন জ্বলবে তা অনুমান করতে পারছিস?'

'আমার কোনও উপায় ছিল না দাদা।'

'মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিলি না কেন? যেখানে ইচ্ছে যেত। আমি যে দিল্লিতে আছি তা তো ওর জানা ছিল না।'

'ওকে ছাড়া যেত না।'

'কেন?'

'দাঁড়াও।' প্রবাল চলে গেল। ফিরে এল একটা সুটকেস আর হাতব্যাগ নিয়ে। সে দুটো রেখে আবার চলে গেল। প্রণবকুমার বাইরে বেরিয়ে এল। দূরে একটা রিকশার ওপরে যে বসে আছে সে কি পূর্ণিমা? মোটাসোটা, আধময়লা গায়ের রঙের স্ত্রীলোকটিকে ধরে ধরে নামিয়ে নিল প্রবাল। নামামাত্র মহিলার চিবুক তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। পরনের শাড়িটি প্রায় আলুথালুভাবে শরীরে জড়ানো। থপ থপ করে হেঁটে এল সামান্য দূরত্ব অনেকটা সময় নিয়ে। প্রবাল বলল, 'দ্যাখো, একে কী করে আমি ছেড়ে দেব।'

'কী হয়েছে ওর?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল প্রণবকুমার।

'জানি না। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাইয়ে দিলে খায়, হাঁটাচলা করে না। শুধু বাথরুম পেলে কুকিয়ে ওঠে, তখন ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে

যেতে হয়। ওঁকে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়ে গিয়েছিল তখন পরনে ঢোলা সেমিজ ছিল। বিশ্বাস করো দাদা, পূর্ণিমাদিদি এখন কাঁদেনও না।' প্রবাল বলল।

শুনতে শুনতে মাথায় একটা উপায় এল। প্রণবকুমার বলল, 'আমি টাকা দিচ্ছি। তুই ওকে বৃন্দাবনে নিয়ে যা। ওখানে অনেক বিধবাদের আশ্রম আছে। তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে।'

'বৃন্দাবন?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দাঁড়া, টাকা এনে দিচ্ছি।'

প্রণবকুমার ঘুরে দাঁড়াতেই পৃথাকে দেখতে পেল। তার পাশ কাটিয়ে দরজায় এসে পূর্ণিমাকে ভাল করে দেখল সে। তারপর প্রবালকে বলল, 'ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো প্রবাল।'

'কী বলছ তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল প্রণবকুমার।

'চেঁচিয়ো না। ওঁর এই অবস্থা দেখেও গলায় এত তেজ? এসো প্রবাল।' প্রবাল পূর্ণিমাকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে আসতেই পৃথা বলল, 'ওই ঘরে। ওটা আমার ঘর।'

পর্ণা অবাক হয়ে দেখছিল। পৃথার ঘরে ঢুকেই মেঝের ওপর বসে পড়ল পূর্ণিমা। তার মাথা নড়তে লাগল। প্রবাল নিচু গলায় বলল, 'পূর্ণিমাদিদি একদম বোবা হয়ে গিয়েছে। মাথা আর কাজ করে না।'

দরজায় দাঁড়িয়ে প্রণবকুমার বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না কী করছ।'

'পারছি। আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'প্রায়শ্চিত্ত? কীসের?'

'তুমি বুঝবে না। পূর্ণিমাদির যা হয়েছে তা তো আমারও হতে পারত। তুমি এখান থেকে সরে যাও। তোমাকে এখন সহ্য করা সম্ভব নয়।'

প্রণবকুমার দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেলে পর্ণা এসে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ও কে?'

পৃথা বলল, 'ওকেই জিজ্ঞাসা করো।'

'ও তো কথা বলছে না। ওরকম হল কেন?'

মেয়ের দিকে তাকাল পৃথা। বলল, 'তোমার বাবা জানে।'

'তা হলে ওকে বাবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

চমকে উঠল পৃথা। তারপর প্রবালকে বলল, 'ঠিকই তো। মেয়ের মাথায় যা এল তা আমার মাথায় আসেনি। শ্বশুরমশাই তো তোমার দাদাকেই দায়িত্ব নিতে বলেছেন। তুমি ওকে তুলে তোমার দাদার ঘরে নিয়ে যাও।'

'দাদা কি—!'

'কী বলতে চাইছ? ওঁর পক্ষে কি দেখাশোনা করা সম্ভব হবে? হবে। পুনের স্মৃতি মনে পড়লেই সেবাযত্ন করতে বাধ্য হবেন। নিয়ে যাও।'

প্রবাল কোনওমতে পূর্ণিমাকে দাঁড় করিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে প্রণবকুমার আঁতকে উঠল, 'এ ঘরে কেন?'

'বউদিদি বলল তোমাকেই দেখাশোনা করতে।'

পাশ থেকে পর্ণা বলে উঠল, 'ওর ওরকম কেন হয়েছে তা তো মা জানে না, তুমি জানো। তাই।'

প্রবাল বলল, 'আমি চলে যাই তা হলে—!'

প্রণবকুমার কিছু বলল না। বাইরে এসে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পৃথার ঘরে ঢুকে প্রবাল দে60খল চোখ বন্ধ করে তাকে শুয়ে থাকতে। চোখ খুলল পৃথা।

'এটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।' বইটা এগিয়ে দিল প্রবাল।

বইটা নিতেই হাসি ফুটল পৃথার মুখে, 'তুমি খুব ভাল।'

'কেন?'

'এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল ওষুধ আমি আর পেতাম না।

'গীতাঞ্জলির' পাতা ওলটাল পৃথা, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/ চরণধুলার তলে।/ সকল অহংকার হে আমার/ ডুবাও চোখের জলে।'

দুটো চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল গালে। তারপর বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। প্রবাল অবাক, 'বউদি, তুমি কাঁদছ?'

কান্না গিলতে গিলতে পৃথা বলল, 'প্রবাল আমার একটা উপকার করবে?'

প্রবাল বলল, 'বলো!'

'পূর্ণিমাদিদিকে আমার ঘরে এনে দাও।' চোখ মুছল পৃথা।

---